সংহিতা
২০২১

"আমি চাই এই মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রীরা যখন শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া বাহিরের জগতে যাইবেন, তাঁহারা যেন পরিপূর্ণ নারীত্বের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইতে পারেন এবং রাজা নরেন্দ্রলাল খানের দেশাত্মবোধ ও আত্মত্যাগের মহান আদর্শ স্মরণে রাখেন।"

ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়
গোপ প্রাসাদ
১০ ই অক্টোবর, ১৯৬১

রাজা নরেন্দ্রলাল খান মহিলা মহাবিদ্যালয় (স্বশাসিত)

(NAAC মূল্যায়িত 'A' গ্রেড প্রাপ্ত মহাবিদ্যালয়)

মেদিনীপুর - ৭২১১০২

সংহিতা

২০২১ সংখ্যা
প্রকাশকাল ঃ ২২ আগষ্ট, ২০২১

সম্পাদনায়
ড. সুজয় কুমার মাইতি
ড. সারদাব্রত লাহা
অধ্যাপক বিভাস চঁন্দ
(যুগ্ম আহ্বায়ক)

প্রকাশনায়
ড. জয়শ্রী লাহা
অধ্যক্ষা,
রাজা নরেন্দ্রলাল খান মহিলা মহাবিদ্যালয় (স্বশাসিত)
গোপ প্রাসাদ, মেদিনীপুর
পশ্চিম মেদিনীপুর
পিন-৭২১ ১০২
দূরভাষ ঃ ০৩২২২-২৭৫৪২৬

মুদ্রণে
মিডল্যাণ্ড কম্পিউটার সেন্টার
মিত্রকম্পাউণ্ড, মেদিনীপুর

সূচীপত্র

গদ্য :

'শান্তিমন্ত্র' পাঠের তাৎপর্য	অধ্যাপিকা গার্গী মেদ্দা	১
সমকাল ও বিদ্যাসাগর	অঙ্কিতা পাণ্ডব	৩
সমকালে বিদ্যাসাগর সমধিক প্রাসঙ্গিক	সুজাতা চক্রবর্ত্তী	৬
বর্তমান সময়ে বিদ্যাসাগরের প্রাসঙ্গিকতা	দেবারতি মাইতি	৯
মনি	বন্দনা দাস	১২
বাংলা ভাষা সাহিত্য ও চিকিৎসাক্ষেত্র	শ্রাবণী মাহাতো	১৪
আধুনিক সমাজে নারী	শ্রেয়সী মিশ্র	১৬
সম্পর্কে গাছ	তিয়াশা মণ্ডল	১৭
বাস্তবতা	মৌমিতা দাস	১৯
প্যারানরমাল এক্সপার্ট	সম্পিতা বাগ	২০
বোধন	তনুশ্রী জানা	২১
সুন্দরবন ভ্রমণের অভিজ্ঞতা	পৌলমী প্রামাণিক	২৪
অভিশপ্ত পূর্ণিমা	সুদীপা সাউ	২৭
কল্পশাখা	কৃষ্ণা বিষই	৩১
দুই প্রজন্ম	শ্রেয়া চক্রবর্ত্তী	৩২
যন্ত্রহীন শূন্যতা	প্রতিভা মাজী	৩৪
A Warm Winter night	Swagata Roy	৩৪

কবিতা :

প্রজন্ম	স্নেহলতা দাস	৩৫
শিউলি ফুল	বিদিশা খুঁটিয়া	৩৫
নিমন্ত্রণ	মৌমিতা শেঠ	৩৬
প্রকৃতির প্রতীক্ষায়...	বৈশাখী দেববর্মন	৩৬
ভালোবাসি	শ্রেয়সী দাস	৩৭
বিষাক্ত প্লাস্টিক	অনুরাধা শীট	৩৭
A Soulmate in a Stranger	Aritri Maiti	৩৭
The Leader	Ritwika Acharjee	৩৮
নারী	রাফিকা খাতুন	৩৮
অব্যক্ত	পলাশ ঘোড়ই	৩৯
মা	সুরঞ্জনা রায়	৩৯
জীবনের প্রতি	মনীষা মণ্ডল	৪০
"বন্দী অথচ সাজানো জীবন"	মৌমিতা রায়	৪১
অগ্নিজন্ম	মৌপর্ণা মুখার্জ্জী	৪১

শিক্ষাগুরু	এ. সিং	৪২
নারী সমাজ	দীপিকা সাউ	৪২
দুদিন এই মুহূর্ত	প্রিয়াঙ্কা ঘড়া	৪৩
মায়াবী প্রকৃতির বিপর্যয়	ঝুমা মান্না	৪৩
মেদিনীপুর থেকে বলছি	বৈশাখী দেববর্মন	৪৪
করোনা	সুপর্ণা দাস	৪৫
Lock Down	Suparna Das	৪৫
কল্পিত	প্রিয়াঙ্কা ঘড়া	৪৬
শিক্ষার আলোকে শিক্ষক	সাক্ষি মিদ্যা	৪৬
অপেক্ষা	মঞ্জুরী রাউত	৪৬
নেতাজী	তিস্তা মিশ্র	৪৭
আজকের নারী	তনুশ্রী কালিন্দী	৪৭
প্রার্থনা	রঞ্জনা চক্রবর্ত্তী	৪৮
ছোট্ট অভিমানী	পারমিতা দাস	৪৮
স্কুল জীবনের স্মৃতি	পায়েল মলমল	৪৯
ভাইফোঁটা	সিমরান আখতার	৫০
আয়ো সরস্বতী	সুলতা সরেন	৫১
কালো মেয়ে	ইলা নন্দ	৫২
মা দুর্গা	বর্ণালি চ্যাটার্জ্জী	৫২
অসুখ	অনুরিমা মাহাত	৫২
পথচলা	সুষমা রানী সাউ	৫৩
করোনা	জয়শ্রী ঘোষ	৫৫
প্রত্যাশা	কণিকা পাত্র	৫৬
Lost and Found	Ankana Mallik	৫৬

ভ্রমণ কাহিনী ও পত্ররচনা :

ভ্রমণ কাহিনী	সুজাতা চক্রবর্তী	৫৭
পত্ররচনা	রিম্পা চ্যাটার্জী	৫৯
পত্ররচনা	সুজাতা চক্রবর্তী	৬১
পত্ররচনা	পাপিয়া জানা	৬৩
পত্ররচনা	পিয়ালী পাত্র	৬৫

অধ্যক্ষার কলমে : কিছু কথা

"শিক্ষার্থীদের মানসলোকে উদিত
নানা খণ্ড-ছিন্ন-বিক্ষিপ্ত ভাবের প্রকাশ
এবারের কলেজ পত্রিকা 'সংহিতা'।"

কালের মন্দিরায় কোন আওয়াজ না তুলে আমাদের এই পবিত্র শিক্ষাঙ্গণ ৬৫ তম বর্ষে পদার্পণ করল। বহু সম্ভাবনাময় 'হৃদয়ের গোপন বিজন ঘরের' কথাগুলি এবারের 'সংহিতা'য় প্রকাশ পাচ্ছে-এ বড় অনাবিল আনন্দের কথা। তাদের মনের মর্মমূল মন্থনের কথাগুলি একদিন পরিব্যাপ্ত পারিপার্শ্বিক জীবনে পূর্ণতা আনবে– এই আত্মিক আকাঙ্ক্ষা রইল। কলেজের পাঠ্যপুস্তকের অন্তর্গত ও বহির্গত বিষয়ের আলোচনায় শিক্ষার্থীদের মানসলোকে নানা খণ্ড-ছিন্ন-বিক্ষিপ্ত ভাবের উদয় হয়। সেই সকল ভাবনা-চিন্তনের বিচ্ছিন্নতাকে গ্রথিত করে একটি সংহত রূপ দেওয়া যায়। এই ভাব-প্রেরণার প্রকাশের তাগিদে এবারের কলেজ পত্রিকা 'সংহিতা' তাদেরকে সযত্নে নিজবক্ষে স্থান দেবে, তারা যেন ভাবীকালের সৃষ্টির সম্ভাবনা নিয়ে পূর্ণক'রে তোলে এবারের পত্রিকাকে।

একটি বৃহত্তর প্রতিষ্ঠানের সার্বিক সুকল্যাণে সকলের আন্তরিক সহযোগিতার প্রয়োজন। এর দ্বারা প্রতিষ্ঠান সামনের দিকে এগিয়ে যায় যথার্থ সমৃদ্ধি নিয়ে। সেই অভিপ্রায়ে সুযোগ্য, সুদক্ষ ও সুহৃদয় মানুষদের নিয়ে কলেজের ছাত্রীনিবাস, অডিটোরিয়াম, খেলার মাঠ, গ্রন্থাগার, ছাত্রীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা, পিছিয়ে পড়া শিশুদের শিক্ষাদান ও মানোন্নয়ন, জিম্‌নেসিয়াম সহ শিক্ষাদানের একটি অনুকূল গঠনমূলক পরিবেশ নির্মাণে সচেষ্ট হয়েছি। আরো সহমর্মী সহযোগিতা পেলে আমাদের এই মহাবিদ্যালয় 'কালের কপোলতলে স্নিগ্ধ সমুজ্জ্বল' হয়ে উঠবে, সময়ের সাগর অতিক্রম করে উত্তরোত্তর নিজেকে বিকাশের সমুচ্চশিখরে দাঁড় করাতে পারবে। কলেজের সামগ্রিক সমৃদ্ধিসাধনে যাঁরা উদার হৃদয়ে হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন, তাঁদের সকলের সর্বাঙ্গীন কল্যাণ কামনা করি।

ড. জয়শ্রী লাহা
অধ্যক্ষা
রাজা নরেন্দ্রলাল খান মহিলা মহাবিদ্যালয় (স্বশাসিত)

সম্পাদকীয়

কালের বহমান ধারায় ভাবী কাল হয় সমাগত, বর্তমানের ক্রোড়ে লালিত হয় অনাগত অভীপ্সার সদ্য পদপাত, আর বর্তমানের লগ্নটি অতীতের সীমায় হয়ে উঠে ঋদ্ধতর। নিরবচ্ছিন্ন এই প্রবাহের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে প্রতি বছরের ন্যায় এবারেও আমাদের মহাবিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা দিবসে নব কলেবরে প্রকাশিত হল 'সংহিতা'-২০২১। পত্রিকার এই নব কলেবর বিনির্মিত হয়েছে নব নব আঙ্গিকে আর বিষয়ের বৈচিত্র্যে। পত্রিকা প্রকাশে আন্তরিক সহযোগিতা করেছেন অধ্যাপক-অধ্যাপিকাবৃন্দ, শিক্ষাকর্মীবৃন্দ, পত্রিকা উপসমিতির সদস্য-সদস্যাবৃন্দ এবং শিক্ষার্থীবৃন্দকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি। এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়, মহাবিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা দিবসের অনুষ্ঠান আয়োজনের গুরুদায়িত্ব পালন করে, শতব্যস্ততার মধ্যেও মহাবিদ্যালয়ের সম্মানীয়া অধ্যক্ষা ড. জয়শ্রী লাহা মহোদয়া পত্রিকা প্রকাশে যে সহৃদয় এবং প্রত্যক্ষ সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে সর্বক্ষণ আমাদের পাশে থেকেছেন তা অভূতপূর্ব। শুধু তাই নয়, তাঁর লেখনী প্রসূত নাতিদীর্ঘ রচনাটি পত্রিকার এক উজ্জ্বল প্রাপ্তি।

পরিশেষে বিনম্রচিত্তে স্বীকার করি, পত্রিকা প্রকাশে সযত্ন-সতর্কতা অবলম্বন সত্ত্বেও যদি কিছু ভুল ভ্রান্তি হয়ে থাকে, তার জন্যে আহ্বায়কগণ ক্ষমাপ্রার্থী। এই প্রসঙ্গে জানিয়ে রাখি যে, মেল-এর মাধ্যমে সাহিত্যের নানা প্রকরণের শিল্প-ফসল চাওয়াতে অনেক শিক্ষার্থী তাদের সৃষ্টির ফসল পাঠিয়েছে। তাতে আমরা খুশি। কিন্তু অনেক লেখায় কোন্ বিভাগ, কোন্ পর্যায় উল্লেখ না থাকায় কেবল তাদের নাম দিয়ে লেখাগুলি প্রকাশ করতে বাধ্য হয়েছি। যারা প্রবন্ধ, ভ্রমণ সাহিত্য ও পত্রলেখা প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছিল তাদের লেখাও এবারে প্রকাশ করেছি।

'সংহিতা'র সর্বাত্মক সমৃদ্ধি কামনায়–

ড. সুজয় কুমার মাইতি
ড. সারদাব্রত লাহা
অধ্যাপক বিভাস চঁন্দ
যুগ্ম-আহ্বায়ক
পত্রিকা উপসমিতি
রাজা নরেন্দ্রলাল খান মহিলা মহাবিদ্যালয়
(স্বশাসিত)

আগস্ট, ২০২১
গোপ প্রাঙ্গণ

‘শান্তিমন্ত্র’ পাঠের তাৎপর্য

অধ্যাপিকা গার্গী মেদ্দা, দর্শন বিভাগ

শান্তিমন্ত্র পাঠ করা হয় শান্তি অর্জনের জন্য। শান্তিমন্ত্রের উৎস হলো উপনিষদ – যা হলো প্রাচীন বৈদিক ধর্মগ্রন্থ। প্রতিটি উপনিষদেই থাকে একটা শান্তিবার্তা। যা শেষ হয় শান্তি, শান্তি, শান্তি, এই শব্দগুলির মাধ্যমে। ‘ওম্ শান্তি’ হলো শান্তিমন্ত্রের প্রাথমিক সংস্করণ। শান্তিমন্ত্র পাঠ করে শান্তিকে আবাহন করা হয়। এটি হিন্দু শাস্ত্রে বিশেষভাবে ব্যবহৃত হয়। অন্য ধর্মে যেমন– বৌদ্ধ এবং জৈন ধর্মেও ব্যবহৃত হয়। বিভিন্ন স্তব, স্তুতি, পদ্য ও গাথার অঙ্গ হিসাবে এই শান্তি মন্ত্রকে খুঁজে পাওয়া যায়।

বৈদিক ঋষিদের মানসিক ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে খুব সূক্ষ্ম জ্ঞান ছিল এবং ধ্যানের উপযোগ্য পদ্ধতিগুলি তারা খুব ভালোভাবে উপস্থাপিত করেছিলেন। যে কোন হিন্দু ধর্মীয় অনুষ্ঠানের শুরুতে বা সমাপ্তিতে শান্ত্রিমন্ত্র পাঠ করা হয়ে থাকে। এই মন্ত্র হলো আমাদের দেহ, মন এবং আত্মার শান্তি কামনার প্রতীক। এটি ব্যক্তিগত দেহ, মন এবং আত্মার শান্তি কামনার প্রতীক। এটি ব্যক্তিগত, সমষ্টিগত এবং বিশ্বজনীন শান্তি প্রতিষ্ঠা করে।

ব্যাখ্যাকারদের মতে কোনো কাজের শুভারম্ভের পূর্বে ব্যক্তির কাছে যে সব বাধাবিঘ্ন আসে বিভিন্ন অজানা শক্তির কাছ থেকে অথবা অন্য কোন মানুষ যা প্রাণীর কাছ থেকে, যা তার দেহ ও মনকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে, তার জন্য তিনবার এই শান্তিমন্ত্র পাঠ করা হয়ে থাকে। আধ্যাত্মিক উপলব্ধি ব্যতিরেকে ধর্ম আমাদের মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে সাহায্য করে। প্রত্যেকেরই শান্তির প্রয়োজন। প্রতিদিনকার জীবনে মানসিক শান্তি একান্ত জরুরী। ‘শান্তি’ শব্দটিকে যদি শান্তভাবে, নিঃস্তব্ধভাবে, শান্তিপূর্ণভাবে তিনবার উচ্চারণ করা হয় তাহলে মনে গভীর প্রশান্তি আসে। সুতরাং যদি কোনো ব্যক্তি কখনও কোন কারণে অস্থিরতাবোধ করে তখন এই উত্তেজনাকে প্রশমিত করার জন্য তাকে ‘শান্তি’, ‘শান্তি’, ‘শান্তি’– এইভাবে পুনরাবৃত্তি করতে হবে। এটা তার দেহে প্রশান্তি প্রদান করে। তাকে কিছুক্ষণ শান্তভাবে বসে ধ্যান করতে হবে, যার ফলে তার মন বাহ্যজগৎ থেকে সরে এসে অন্তর্মুখী হবে এবং যার ফলে শান্তির ধারণার দ্বারা সে তার চিত্তকে সিক্ত করতে পারবে।

মানসিক শান্তির প্রথম ধাপ হলো দৈহিক শৃঙ্খলা রক্ষা করা। যদি কোনো ব্যক্তি একাগ্রচিত্তে দৈহিক নিয়ন্ত্রণ অনুসরণ করেন এবং সেটি যদি অভ্যাসে পরিণত হয় তাহলে কখনই কোন অবস্থাতেই বিচলিত তিনি হবেন না। দৈহিক শান্তি ব্যতীত মানসিক শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। সুতরাং প্রত্যেকেরই তার নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ কায়েম করা প্রয়োজন।

প্রত্যেকেরই উচিত যে সমস্ত চিন্তা ভাবনা আমাদের বিরক্ত করে, অস্থির করে তোলে, উদ্বিগ্ন করে সেগুলিকে মন থেকে দূরীভুত করা। কারণ প্রতিটি চিন্তাই মনকে প্রভাবিত করে। যারা আমাদের পূজাপদ্ধতি সম্বন্ধে অবহিত তারা জানেন যে, ‘ভূত সমাধি’ নামক একটি পদ্ধতি আছে (উপকরণের শুদ্ধিকরণ), মানসিক স্থিরতা তখনই আসে যখন মন সব বিরক্তি উৎপাদন কারী চিন্তা থেকে মুক্ত হয়। প্রার্থনায় উপবেশন হবার আগে আমাদের উচিত ওই সমস্ত চিন্তাগুলি পরিত্যাগ করা। আমাদের স্বাভাবিক চিন্তা-ভাবনাগুলো ধ্যানের পক্ষে তত ক্ষতিকারক নয়। যে সমস্ত চিন্তাগুলো সঠিক নয় তাদেরকেই পরিত্যাগ করা উচিত। ‘ভূত সমাধি’তে প্রথমেই মনের আবর্জনাগুলোকে শুকিয়ে ফেলা হয় এবং তারপর পুড়িয়ে ফেলা হয়। এবং চিন্তা করা হয় যে, যোগীক অমৃত, শরীরের প্রতিটি অঙ্গে প্রবাহিত হয়ে একে বিশুদ্ধ করে ও সংগঠিত করে। এই ধ্যানের ফলশ্রুতি স্বরূপ পরমসত্তার উপলব্ধি হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ সাধনার সময় পাপ পুরুষকে বংস করার কথা বলেছিলেন। বর্তমানে এই পদ্ধতি মনস্তাত্ত্বিকদের দ্বারা প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। তারা বলেন, শোবার আগে আমাদের বিরক্তিকর চিন্তাগুলোকে একটি কাগজখণ্ডের

উপর লিখে কাগজখণ্ডটিকে ছুড়ে ফেলে দিতে হবে। এই পদ্ধতিতেই শোবার আগে মন থেকে বিব্রতকর চিন্তাগুলো দূরীভূত হয়। এই পদ্ধতিই মনের সঙ্গে পরমসত্তার চিন্তা যুক্ত করে।

'শান্তি' কথাটি তিনবার উচ্চারিত হয় দেহ, মন এবং আত্মার শান্তির জন্য এবং অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতকে শান্তিপূর্ণ করার জন্য।

'শান্তি' কথাটি যখন প্রথম উচ্চারিত হয় তখন দেহকে শুদ্ধ করে এবং দেহকে সমস্ত দুঃখ, কষ্ট ও অস্বাচ্ছন্দ্য থেকে মুক্ত করে। দেহ পরিশুদ্ধ হয়ে ওঠে। এটি যখন দ্বিতীয়বার উচ্চারিত হয় তখন মনের মধ্যে এক অবর্ণনীয় শান্তি বিরাজ করে এবং মন সমস্ত নেতিবাচক অনুভূতি, দুশ্চিন্তা, উদ্বেগ এবং অস্থিরতা থেকে মুক্ত হয়। এই মন্ত্রটি তৃতীয়বার উচ্চারিত হলে এক উচ্চ আধ্যাত্মিক অনুভূতি অনুভূত হয় যা ব্যক্তির আত্মাকে স্পর্শ করে। এটি হলো ব্যক্তির নিজের মধ্যে পরমসত্তাকে উপলব্ধি করার যথার্থ সময়।

অন্য এক অর্থে, 'শান্তি' কথাটি তিনবার উচ্চারিত হয় নিজের জন্য, পরিবার, আত্মীয়, বন্ধুবর্গের জন্য এবং পরিশেষে বৃহৎ অর্থে বিশ্বের জন্য। 'শান্তিমন্ত্র' এর প্রার্থনা করা হয় বিশ্বের সমস্ত প্রাণীর শান্তির জন্য।

শান্তিমন্ত্র পাঠ মনকে ধ্যানের উপযুক্ত করে তোলে। ধ্যানের পদ্ধতি আছে। ধ্যানের যোগ্য আসনে শিথিল অবস্থায় উপবেশন করতে হবে। মেরুদণ্ডকে এবং মেরুদণ্ডের সঙ্গে যুক্ত অঙ্গগুলোকে সারিবদ্ধভাবে সোজা ভঙ্গিমায় রাখতে হবে। হাত দুটিকে ধ্যানের ভঙ্গিমায় কোলের উপর রাখতে হবে। গভীরভাবে নিঃশ্বাস নিতে হবে এবং বলতে হবে 'ওম্ শান্তি – শান্তি – শান্তি'।

'শান্তিমন্ত্র' পাঠের উল্লেখযোগ্য মনস্তাত্ত্বিক উপকারিতা আছে। এটি মনকে চাপ ও উদ্বেগমুক্ত করতে সাহায্য করে। শান্তিমন্ত্র আমাদের আশাবাদী করে, দৈহিক কার্যকলাপের উন্নতি ঘটায়, দেহের আভ্যন্তরীণ প্রত্যঙ্গগুলিকে সাহায্য করে তাদের সর্বোত্তম ক্ষমতায় কাজ করতে। শান্তিমন্ত্রের বার বার উচ্চারণে ব্যক্তির মনে অনুভূত হয় এক গভীর শীতলতা যা ব্যক্তিকে বাহ্যজগৎ থেকে মুক্ত করে আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে যুক্ত করে, যার ফলে ব্যক্তি অতি সূক্ষ্ম এবং গভীর অভিজ্ঞতার সঙ্গে সম্পর্কিত হয়।

শান্তিমন্ত্র হলো মহাজাগতিক শান্তির বাহক। ধ্যানের সময় যাতে কোন বিচ্যুতি না ঘটে তার জন্য প্রারম্ভেই শান্তিমন্ত্র পাঠ করা হয়। যোগ অভ্যাসের সময়, শুরুতে এবং সমাপ্তিতে এই মন্ত্র পাঠ করা হয়ে থাকে। এর একটা দার্শনিক অর্থও আছে। এটা আমাদের পরমসত্তার কথা স্মরণ করিয়ে দেয় এবং পরমসত্তার সঙ্গে মিলিত হবার পদ্ধতিও নির্ধারণ করে দেয়। যা যথাযথভাবে অনুসরণ করলে আমরা নিজের প্রকৃত স্বরূপকে উপলব্ধি করতে পারবো– যা হলো শান্তিময় আত্মা।

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে শান্তিমন্ত্র পাঠের উপযোগিতার উপর আলোকপাত করা যেতে পারে:

১। আমাদের যদি দেহ পরিশুদ্ধ করে মন ও আত্মাকে শান্ত করতে হয় তাহলে শান্তিমন্ত্র পাঠ আবশ্যিক। এটি সমস্ত দুঃখ, উদ্বেগ এবং নেতিবাচক মনোভাব দূর করে।

২। শান্তিমন্ত্র পাঠ দৈহিক, দৈবিক এবং আভ্যন্তরীন বাধাবিঘ্ন দূর করে।

৩। শান্তিমন্ত্র পাঠ আমাদের সমস্যাগুলির সমাধান করে দিয়ে আমাদের চাপমুক্ত করে দেয়।

৪। এটি পরমসত্তাকে উপলব্ধি করতে সাহায্য করে। বিশ্বের পরিপূর্ণতাকে গ্রহণ করতে সাহায্য করে। বহির্বিশ্বে যে শান্তি বিরাজমান তাকে উপলব্ধি করতে এবং গ্রহণ করতে শেখায়।

৫। এটি আমাদের হৃদয়ে মানবতাবোধের উন্নতি ঘটায়– অন্যের প্রতি সহানুভূতিশীল হবার ক্ষমতা আমাদের মনে জাগরিত করে।

৬। এটি বিভিন্ন আধ্যাত্মিক অনুভূতি লাভে সাহায্য করে এবং জীবনের গভীর থেকে গভীরতর অভিজ্ঞতার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত করে।

সমকাল ও বিদ্যাসাগর

অঙ্কিতা পাণ্ডব, বাংলা অনার্স, তৃতীয় বর্ষ

"বঙ্গসাহিত্যের রাত্রি স্তব্ধ ছিল তন্দ্রার আবেশে
অখ্যাত জড়ত্বভারে অভিভূত। কি পুণ্য নিমেষে
তব শুভ অভ্যুদয়ে বিকরিল প্রদীপ্ত প্রতিভা।
প্রথম আশার রশ্মি নিয়ে এল প্রত্যুষের বিভা
বঙ্গভারতীর ডালে প্রথম জয়টীকা।" – রবীন্দ্রনাথ

ভূমিকা ঃ

ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা ও বাঙালির নবজাগরণ ও বিকাশে যে গুটিকয়েক মহাপ্রাণ পুরোধা ঋষি পুরুষ জ্ঞান বিবেক ও পৌরুষের মাহাত্ম্যে উদ্ভাসিত হয়ে জাতির ও সংস্কৃতির নিজস্ব ভাষা নির্মাণে অনবদ্য অনুরণন তুলে চির ভাস্বর হয়ে আছেন তাদের মধ্যে পুণ্যশ্লোক মহাপ্রাণ পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন অন্যতম এবং স্বতঃপ্রদীপ্ত আলোকবর্তিকা। বিধবা বিবাহ প্রবর্তন, নারীশিক্ষার প্রসার থেকে বর্ণপরিচয় প্রবর্তন, অক্ষর থেকে শুরু করে সমাজের সনাতনী জীবনবোধে তিনি হয়ে উঠেছেন 'দয়ার সাগর', 'বিদ্যাসাগর' এবং 'করুণাসগর'। তাঁর জন্মের দ্বিশতবর্ষ অতিক্রান্ত হলেও সমকালেও তিনি সমানভাবে প্রাসঙ্গিক। বরং আলো যত দূরে সরে গেছে ততই যেন দীর্ঘ হয়েছে ছায়া। মাইকেলের ভাষায় তাই যেন,–

"দানে বারি নদীরূপ বিমলা কিঙ্করী;
যোগাইলে অমৃত ফল পরম আদরে।"

জন্ম ও বংশপরিচয় ঃ

১৮২০ খ্রিষ্টাব্দের ২৬ শে সেপ্টেম্বর অবিভক্ত মেদিনীপুর জেলার বীরসিংহ গ্রামে বিদ্যাসাগর জন্মগ্রহণ করেন। পিতা ঠাকুর দাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও মাতা ভগবতী দেবী। দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবার। কিন্তু দারিদ্র্য বিদ্যাসাগরের বলিষ্ঠ মানসিকতাকে এতটুকু দুর্বল করতে পারেনি। দরিদ্র পরিবারে জন্মে দারিদ্র্যের মধ্যে জীবন কাটিয়েও বিদ্যাসাগর বাঙালি জাতিকে শিখিয়েছেন যে কর্ম, নিষ্ঠা ও আত্মবিশ্বাসের জোরে কীভাবে এত ব্যক্তিত্বশালী পুরুষ হওয়া যায়। এপ্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,–

"অনেক মহৈশ্বর্যশালী রাজা রায়বাহাদুর প্রচুর ক্ষমতা লইয়া যে উপাধি লাভ করিতে পারে নাই এই দরিদ্র পিতার দরিদ্র সন্তান সেই 'দয়ার-সাগর' নামে বঙ্গদেশে বিখ্যাত হইয়া রয়েছেন।"

তৎকালীন সমাজ ও চারিত্রিক গুণাবলী ঃ

বিদ্যাসাগর যে যুগে জন্মগ্রহণ করেছিলেন সেই যুগ ছিল 'Age of reason and rights of man'-এর। কুসংস্কারের অচলায়তনে বাঙালি সমাজ যখন বদ্ধ, শাস্ত্রীয় নিয়মের দোহাই দিয়ে কিছু তথাকথিত সমাজপতিরা যখন সমাজের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা তখন বিদ্যাসাগর একক প্রয়াসে সেই অচলায়তনের প্রাচীরকে যুক্তি দ্বারা ভেঙে ফেলে মানবত্বের জয় ঘোষণা করেছিলেন। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে অশাস্ত্র, অশিক্ষা ও কুশিক্ষার ঘেরাটোপে পড়ে মানুষ তার মনুষ্যত্বকে বিকশিত করতে পারছে না। তাই তিনি তাঁর জীবন উৎসর্গ করেছিলেন 'বহুজনহিতায়'র উদ্দেশ্যে।

বাল্যকাল ও বিদ্যাশিক্ষা ঃ

বিদ্যাসাগর অতি শৈশবেই গ্রামের চতুষ্পাঠীতে শিক্ষালাভ সমাপ্ত করে দরিদ্র পিতার হাত ধরে পাড়ি দেন শহর কলকাতায়। কলকাতায় অত্যন্ত দারিদ্র্যের সাথে শুরু হয় তাঁর শিক্ষাজীবন। আপন মেধা ও প্রতিভা বলে তিনি সমস্ত বাধা অতিক্রম করে সংস্কৃত কলেজে প্রবেশ করলেন। সেখানে প্রতি বছর প্রথম স্থান অধিকার করে বৃত্তি লাভ করতে লাগলেন। কলকাতায় তাঁকে বাড়ির সমস্ত কাজ স্বহস্তে সম্পাদন করতে হত। একদিকে অবর্ণনীয় দারিদ্র্য এবং অন্যদিকে অসাধারণ অধ্যয়নস্পৃহা। কিন্তু দারিদ্র্যের সুতীব্র কশাঘাত তাকে বিদ্যার কঠোর তপস্যা থেকে নিবৃত্ত করতে পারেনি। অসীম প্রতিভাবলে তিনি বিভিন্ন শাস্ত্রে কৃতিত্ব প্রদর্শন করে লাভ করলেন দুর্লভ 'বিদ্যাসাগর' উপাধি। আবার কেবল সংস্কৃত বা প্রাচ্যবিদ্যা নয়, ইংরেজী শিক্ষার প্রতিও ছিল তাঁর প্রগাঢ় অনুরাগ। তাই সংস্কৃত কলেজে শিক্ষালাভের পাশাপাশি স্বচেষ্টায় চলেছিল তার ইংরেজী শিক্ষাও। এইভাবে কঠোর অধ্যাবসায় এবং অমানুষিক পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে তার জীবনের প্রস্তুতি পর্ব সমাপ্ত হয়।

সমাজসংস্কারক বিদ্যাসাগর ঃ

কৌলিণ্য ও বহুবিবাহ প্রথার কারণে বিধবাদের সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকে। ঘরে ঘরে বৈধব্যের করুণ ক্রন্দনে বিগলিত হল তার হৃদয়। মাতা ভগবতী দেবীর প্রেরণায় তিনি সমাজে বিধবা বিবাহ প্রবর্তনের জন্য কৃতসংকল্প হন। বহু বাধা ও প্রতিরোধ অতিক্রম করে শেষ পর্যন্ত ১৮৫৬ সালে বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টায় বিধিবদ্ধ হল বিধবা বিবাহ। বিধবা বিবাহ প্রবর্তন তাঁর জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কর্ম। বাল্যবিবাহ নিবারণও তাঁর অন্যতম কীর্তি।

শিক্ষাবিস্তার আন্দোলনে বিদ্যাসাগর ঃ

সমাজে যত দাসত্ব, অন্ধকার, যত ব্যভিচার এর সবকিছুর মূলেই রয়েছে অশিক্ষা। কুসংস্কারের বাঁধনে জড়তাগ্রস্ত সমাজে শুভ বুদ্ধির উদ্বোধনে শিক্ষার গুরুত্ব কতখানি তা উপলব্ধি করে বিদ্যাসাগর শিক্ষাবিস্তারে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। বিদ্যাসাগর বাঙালি জাতিকে অশিক্ষার তমসা থেকে জ্যোতির্ময় আলোকে আনতে চেয়েছিলেন। এই শিক্ষাবিস্তার মানসে তিনি নির্বিচারে গ্রামে গ্রামে বহু বিদ্যালয় স্থাপন করেছেন। কেবল পুরুষদের মধ্যেই নয় স্ত্রী জাতির মধ্যেও শিক্ষাবিস্তারে তাঁর সমান আগ্রহ ছিল। সারা বাংলায় অসংখ্য বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন তাঁর অবিস্মরণীয় কীর্তি। এমনকি তিনি বয়স্ক কৃষিজীবি মানুষদের জন্য কার্মাটারে নাইট স্কুল খোলেন। শিক্ষাবিস্তারের ক্ষেত্রে তাঁর অবদান সত্যিই স্মরণীয়।

বাংলা গদ্যের বিকাশে বিদ্যাসাগর ঃ

বাংলা গদ্যের যথার্থ শিল্পরূপদান ঘটে বিদ্যাসাগরের লেখনীতেই। বাংলা গদ্যের প্রাথমিক পর্যায়ে তাঁর গদ্যরচনা ঐতিহাসিক তাৎপর্যে মণ্ডিত। প্রসঙ্গত বিদ্যাসাগরের মূল্যায়ণ রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,–

> "বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যের প্রথম যথার্থ শিল্পী ছিলেন। তৎপূর্বে বাংলায় গদ্য সাহিত্যের সূচনা হইয়াছিল, কিন্তু তিনিই প্রথম বাংলা গদ্যে কলানৈপুণ্যের অবতারণা করেন।"

বিদ্যাসাগর কর্কশ ও অমসৃণ বাংলাভাষাকে নমনীয়তা দান করেছেন। এবং একইসঙ্গে তাকে শিল্পরূপও দান করেছেন। বিদ্যাসাগর যতিচিহ্নের প্রবর্তন দ্বারা বাংলা ভাষাকে সকল প্রকার ভাব প্রকাশের উপযোগী করে তুলেছেন। এপ্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছেন,–

> "বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যভাষার উৎশৃঙ্খল জনতাকে সুবিভক্ত, সুবিন্যস্ত, সুপরিচ্ছন্ন ও সুসংহত করিয়া তাহাকে সহজগতি ও কার্যকুশলতা দান করিয়াছেন।"

সাহিত্য কীর্তি ঃ

বাংলা সাহিত্য বিদ্যাসাগরের অবদানের কাছে গভীরভাবে ঋণী। বিদ্যাসাগরের সাহিত্য রচনাকে মূলত পাঁচটি ভাগে বিভক্ত করা যায়, যথা– **(১) অনুবাদমূলক –** 'সীতার বনবাস', 'ভ্রান্তিবিলাস', 'শকুন্তলা' ইত্যাদি। **(২) শিক্ষামূলক –** 'বর্ণপরিচয়', 'কথামালা', 'বোধোদয়' ইত্যাদি। **(৩) সমাজ সংস্কার মূলক –** 'বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব', 'বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক বিচার' ইত্যাদি। **(৪) লঘুরচনা –** 'অতি অল্প হইল', 'আবার অতি অল্প হইল' ইত্যাদি। **(৫) মৌলিক রচনা –** 'বিদ্যাসাগর চরিত', 'প্রভাবতী সম্ভাষণ' ইত্যাদি।

মাতৃভক্ত 'দয়ার সাগর' বিদ্যাসাগর ঃ

বাংলাদেশে বিদ্যাসাগরের প্রকৃত পরিচয় 'দয়ার সাগর', 'করুণা সাগর' নামে। তাঁর দয়ার তুলনা নেই। তাই শ্রীমধুসূদন বলেছেন,–

"বিদ্যার সাগর তুমি বিখ্যাত ভারতে
করুণার সিন্ধু তুমি সেই জানে মনে
দীন যে দীনের বন্ধু;"

তাঁর মাতৃভক্তি তো জনপ্রবাদে পরিণত হয়েছে। দয়া, ক্ষমা, প্রেম, পরদুঃখকাতরতা ইত্যাদি গুণগুলি তিনি যেন করুণার প্রতিমূর্তি ভগবতীদেবীর কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রেই লাভ করেছিলেন। বিদ্যাসাগর যে পরদুঃখমোচনে ব্রতী হয়েছিলেন তাতে ভগবতীদেবীই তাঁকে প্রেরণা দিয়েছিলেন নিরত এবং নিয়ত।

চারিত্রিক কিংবদন্তি বিদ্যাসাগর ঃ

বিদ্যাসাগরের মতো সংগ্রামী বলিষ্ঠচেতনা, এমতন অসাধারণ পৌরুষশালী ব্যক্তিত্ব যা কেবল পাশ্চাত্য দেশেই সম্ভব। তা যে কীরূপে এদেশে সম্ভব হল তা সত্যিই বিস্ময়ের বিষয়। তাঁর চরিত্রে কঠোরতা ও কোমলতার ঘটেছিল অপূর্ব সমন্বয়। তিনি দয়ার ক্ষেত্রে ছিলেন কুসুমাদপি কোমল এবং কর্মের ক্ষেত্রে ছিলেন বজ্রাদপি কঠোর।

উপসংহার ঃ

১৮৯২ সালের ২৯ শে জুলাই এই অজেয় পৌরুষশিখা হল চির নির্বাপিত। তবু বিদ্যাসাগরের চারিত্রিক গুণাবলী আমাদের বর্তমান জীবনেও সমভাবে প্রাসঙ্গিক রয়ে গেছে। বর্তমানেও যে তাঁর গুরুত্ব কতখানি অপরিসীম সে প্রসঙ্গে নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় বলেছেন,–

"আজকের বাঙালীর পক্ষে সবচেয়ে বেশি দরকার হল, সেই টিকিওয়ালা বাঙালি ইংরেজকে আমাদের প্রতিদিনকার জীবনের ক্ষেত্রে জ্যান্ত করে তোলা।"

সমকালে বিদ্যাসাগর সমধিক প্রাসঙ্গিক

সুজাতা চক্রবর্ত্তী, ইতিহাস অনার্স, দ্বিতীয় বর্ষ

"বিদ্যার সাগর তুমি বিখ্যাত জগতে
করুনার সিন্ধু তুমি সেই জানে মনে,
দীন যে দীনের বন্ধু!"

উনিশ শতকে বাংলার নবজাগরণের অন্যতম দীপশিখা বিদ্যাসাগর মহাশয় আজও অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক এবং ভাবীকালেও সমান প্রাসঙ্গিক থাকবেন। যে গঙ্গার প্রবাহ মরে গেছে, এবং সেই গঙ্গার ডোবা আছে। আর যে গঙ্গা প্রবাহমান সেই গঙ্গা সরে এসেছে, সমুদ্রের সঙ্গে তার যোগ, সেই গঙ্গাকেই আমরা আধুনিক গঙ্গা বলি। কবিগুরুর মতে সেই আধুনিক কালগঙ্গার সাথে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের যোগ। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় যে যুগে জন্মগ্রহণ করেছিলেন সেই সময় দেশাচার গভীর ক্ষতের মতো চেপে বসেছিল সমাজের ওপর। কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয় যুগকে অতিক্রম করেছেন তাঁর নিকট ভাবীকালের অবস্থান ছিল, যা পরিবর্তনশীল। সেই আধুনিক মানুষটি সমকালে নয় সব যুগেই প্রাসঙ্গিক।

তিনি রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। সংস্কৃত বিদ্যাচর্চা করে শৈশব থেকে বড়ো হয়েছেন কিন্তু পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণ করতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করেননি। তিনি জানতেন বিদ্যার মধ্যে পূর্ব পশ্চিমের বিরোধ নেই, এমন গভীর ভাবনা কেবল সভ্যতার মিনার পাংশু হওয়ার সাথে সাথে সময়ের সাথে লীন হয়ে যাবে না প্রত্যেক যুগে প্রাসঙ্গিক হয়ে থাকবে চিরায়ত মহাকালের মতো। তিনি দেশীয় বস্ত্র পরিধান করে বিদেশী বিদ্যাকে সাগ্রহে, উৎসাহের সাথে বরণ করে নিয়েছিলেন এটি বেশী রমনীয় হয়েছিল। এবং আমরা প্রাচ্য বিদ্যার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করি স্বাভিমানবশত, কিন্তু তাঁর হৃদয় উৎসারিত শ্রদ্ধা ছিল অমলিন। এ চেতনার ক্ষয় নেই সমকালে অভিনবভাবে প্রাসঙ্গিক। তাঁর হৃদয়ে দয়া ও করুনাধারার উৎস ছিল ফল্গুধারার মতো। তাঁর করুণা প্রবৃত্তির উত্তেজনা ছিল না, আত্মস্বার্থবিবেচনা করে নিছক দয়া প্রদর্শন ছিল না, আত্মা থেকে নির্গত পবিত্র করুণা ও দয়ার অপূর্ব সমাবেশ ছিল। যা সমকালে মানুষের আত্মার বিকাশের ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক।

'আমি দেশাচারের নিতান্ত দাস নহি'

তিনি পাথরের দেবতাকে দেবতাজ্ঞান করেননি। তাঁকে কাশীর পূজারী ব্রাহ্মণ যখন প্রশ্ন করেছিলেন তিনি কাশীর বিশ্বেশ্বর ও অন্নপূর্ণাও কি মানেন না তখন তিনি পিতা মাতাকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন– এই আমার বিশ্বেশ্বর ও অন্নপূর্ণা এতে পূজারী শুদ্ধ হন। তাঁর নির্দিষ্ট কোনো ধর্ম ছিল না। মানবতাবাদই তাঁর প্রধান ধর্ম ছিল। এই বোধ এই একবিংশের অঙ্গনে সমধিক প্রাসঙ্গিক, যেখানে ভেদবুদ্ধি মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে, সাম্প্রদায়িকতা সমাজের অন্দরে করাল থাবা বসাচ্ছে।

বিবেকানন্দ একবার বলেছিলেন ভগীনী নিবেদিতাকে বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রসঙ্গে – "রামকৃষ্ণদেবকে আমি প্রথম গুরু মানি আমার দ্বিতীয় গুরু ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়, মানুষের জন্য এত প্রেম এত দয়া আর কারো মধ্যে দেখেননি।"

উনিশ শতকে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় বাদে আর কোনো মানুষের সঙ্গে বড়ো ব্যক্তিত্বের এত জনসংযোগ ছিল না। তিনি মুসলমান ভিক্ষুর সাধ পূরণ করার জন্য দই, লুচি খাইয়েছেন। কলেরা আক্রান্ত বৃদ্ধার মলমূত্র পরিষ্কার করেছেন, দুঃস্থ ক্রিশ্চান মহিলাকে অর্থ সাহায্য করেছেন ও কার্মাটারে ভূট্টা ক্রয় করে সেখানকার অধিবাসীদের মধ্যে আবার বিক্রয় করেছেন। সমকালে জনগণের সাথে এমন অভূতপূর্ব জনসংযোগের অনন্য

প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে।

তিনি পরাশর সংহিতার সেই চরণ–

"নষ্টে, মৃতে, প্রবাজতে, মৃতে চ পতিতৌ পতো
পঞ্চস্বাপৎ সু নারীনাং, পতিরণৌ বিধিয়তে।"

দ্বারা বিধবা বিবাহের প্রবর্তন করেন। তাঁর বুদ্ধির প্রাখর্য, জ্ঞান তপস্যা জনসাধারণের কল্যাণে এইরূপে নিয়োজিত করেছিলেন যার প্রাসঙ্গিকতা যুগ যুগ ধরে অব্যাহত থাকবে।

'বিধবা বিবাহ হওয়া উচিত কিনা এতৎ বিষয়ক প্রস্তাব'

এই প্রবন্ধ টি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উষ্ণ দরাজী হৃদয় ও শিল্পী হাতের স্পর্শে অনন্য সাধারণ হয়ে উঠেছিল সেখানে তিনি উপসংহারে লিখছেন– "হা অবলাগণ! তোমরা কি পাপে ভারতে আসিয়া জন্মগ্রহণ কর, বুঝিতে পারি না।" এ যেন বিদ্যাসাগর রূপ বাঙালি মায়ের একফোঁটা চোখের জল।

নারীশিক্ষা বিস্তারে তাঁর অবদান তুলনীয় নয়, বিভিন্ন মডেল স্কুল স্থাপন ও নারীদের শিক্ষিত করে তোলার জন্য যে আত্মনিবেদন তা যুগযুগ ধরে প্রাসঙ্গিক হয়ে থাকবে। এছাড়াও সিপাহী বিদ্রোহের পূর্বে নবাব সিরাজদ্দৌলার পরাজয়ের পর, পলাশির যুদ্ধ নামক প্রহসনের পর ইংরেজরা যখন আধিপত্য কায়েম করেছে, এবং নিজেদের স্বার্থে বাঙালিদের শিক্ষীত করতে চাইছে তখন বিদ্যাসাগর মহাশয় ঔপনিবেশিক শিক্ষার পালের হাওয়াকে এক ভিন্ন দিকে ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন তিনি চেয়েছিলেন সমস্ত দেশবাসী যেন প্রকৃত শিক্ষিত হয়ে ওঠে। এই প্রয়াস সমকালে এক মূল্যবাদ কর্মযোগের স্বাক্ষর রেখেছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মধ্যমভ্রাতা শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন বিধবাবিবাহ প্রসঙ্গে যখন এই বিধবা বিবাহ থেকে বিরত না হলে আত্মীয়রা তাঁকে ত্যাগ করতে পারে এই প্রসঙ্গে পত্র লেখেন তখন তার উত্তরে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় লেখেন– "বিধবা বিবাহ আমার জীবনের সর্বাপেক্ষা পূতপবিত্র কর্ম, এমন কর্ম জীবনে পরে আর করিত পারিব কিনা মনে হয় না ইহার জন্য প্রানশঙ্কা উপস্থিত হইলে তা স্বীকার করতে রাজি ইহার কাছে স্বজন পরিত্যাগ অতি সামান্য ব্যাপার।" এমন মননের প্রাসঙ্গিকতা যুগোত্তীর্ণ। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের হৃদয়ের উদারতাও এক দুর্লভ মানবতাবাদী চরিত্র সম্পর্কে সন্ধান পাওয়া যায়।

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী বলেছেন যে আমরা বাঙালিত্ব নিয়ে অনেক গর্ববোধ করি, আমরা যাঁরা বড়ো মানুষ হিসেবে অহংকার করি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট অনেক ছোট হয়ে যাব। এবং এই ছোটত্বের মাঝখানে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় শুভ্র হিমালয়ের মতো দাঁড়িয়ে থাকবেন। তিনি মাথাব্যথায় কষ্ট পেয়ে যখন চিকিৎসা করান এলোপ্যাথিতে তাঁর ব্যধি সারেনি। হোমিওপ্যাথিতে সেরে যায়। তিনি হোমিওপ্যাথির বই পড়া শুরু করেন, কঙ্কাল নিয়ে পড়াশুনা শুরু করেন মানবঅঙ্গের অবস্থান জানার জন্য। তিনি কার্মাটারে সাঁওতালদের চিকিৎসা করেছেন। এক বৃদ্ধার বাড়িতে গিয়ে চিকিৎসা করে ওষুধ ও পথ্য দিয়ে এসেছেন। সেই সময়েই তাঁর সমাজভাবনা কত গভীরে ছিল, যার প্রাসঙ্গিকতা অত্যন্ত উপযোগী। এছাড়াও হিন্দু কলেজ যেখানে কেবলমাত্র ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়রা পড়াশোনা করতে পারত সেখানে সেই কলেজের দ্বার তিনি সমস্ত শ্রেনীর জন্য উন্মুক্ত করে দেন। ওই কুসংস্কারাচ্ছন্ন যুগের বলা তিনি এইভাবেই উন্মোচন করেন। এমন আধুনিক মনোভাব কালের গন্ডি অতিক্রম করেছে যা ভাবীকালেও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক থাকবে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন– "তাঁর চরিত্রের মহৎ গুণ দয়া, করুনা নয়, অক্ষয় মনুষ্যত্ব" এছাড়াও বাংলা সাহিত্যের প্রাঙ্গণে আদি কবি তিনি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন– 'জীবনস্মৃতিতে' কেবলই মনে পড়ে 'জল পড়ে পাতা নড়ে।' বাংলা সাহিত্যের সোপান তাঁর হাত ধরেই রচিত হয়েছে, গদ্যসাহিত্যে অসামান্য অবদান যতদিন বাংলা সাহিত্য অক্ষয় থাকবে ততদিন প্রাসঙ্গিক থাকবে।

দেশের দেবতাকে তিনি পূজা করেননি যে দেবতা জনগণকে পিষে মেরেছে, সে দেবতাকে পূজা করেননি

নারীকে সে দেবতা লাঞ্ছনা করেছে সেই লাঞ্ছনা দূর করার জন্য শাস্ত্র থেকে যুক্তি বার করেছেন কিন্তু শাস্ত্রের যুক্তি ছিল উপলক্ষ্য মাত্র। মানুষের জন্য যে দয়া, করুনা, কর্মযোগের অকুণ্ঠ প্রয়াস শুরু হয়েছিল তা শাস্ত্রবচনের প্রভাবে নয় তা আত্মার ঔদার্যে উদ্ভূত হয়েছিল। তাঁর করুনা, প্রেমধর্ম ধর্মবুদ্ধিগত নয় মনোবুদ্ধিগত যা সমস্ত যুগেই সমধিক প্রাসঙ্গিক। হাইটেক সভ্যতার ভোগবাদী জনতার ভিড়ে মূল্যবোধ হারিয়ে গেছে, সেই মূল্যবোধের যে চরম প্রকাশ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মধ্যে দেখা গিয়েছিল তা আজও প্রাসঙ্গিক।

বিদ্যাসাগর মহাশয় যদি মানুষের মনোরঞ্জন করতেন তবে এতদিনে অবতারের পদ পেয়ে বসতেন। কিন্তু তিনি অনায়াসেই মুটের মতো তথাকথিত বাবুর ব্যাগ বয়ে নিয়ে যেতে পারেন, স্বদেশের পোশাক পরিধান করে ইংরেজদের যথোচিত শিক্ষা দিতে পারেন। এমন শক্তিশালী মেরুদণ্ড যুক্ত মানুষের অভাব সমকালে তাই তাঁর মতো মানুষের প্রাসঙ্গিকতা এক যুগের অবসানেও কখনো ম্লান হবে না অক্ষয়, শাশ্বত হয়ে থাকবে তাঁর পৌরুষ। তাঁর স্মরণসভা বছর বছর অনুষ্ঠিত হয় আমরা তাঁর যথার্থ উত্তর সাধক হতে পারিনি। শুভদিন অনতিদূরে তাই তাঁর উদ্দেশ্যে আমাদের প্রার্থনা–

"হে ঈশ্বর এসো ফিরে বিচিত্র মায়াময় ধরাতলে
সভ্য অসভ্যের পাট দাও আরো একবার,
কুসুম কোমল হৃদয়ের আর্দ্র সুরভীতে।"

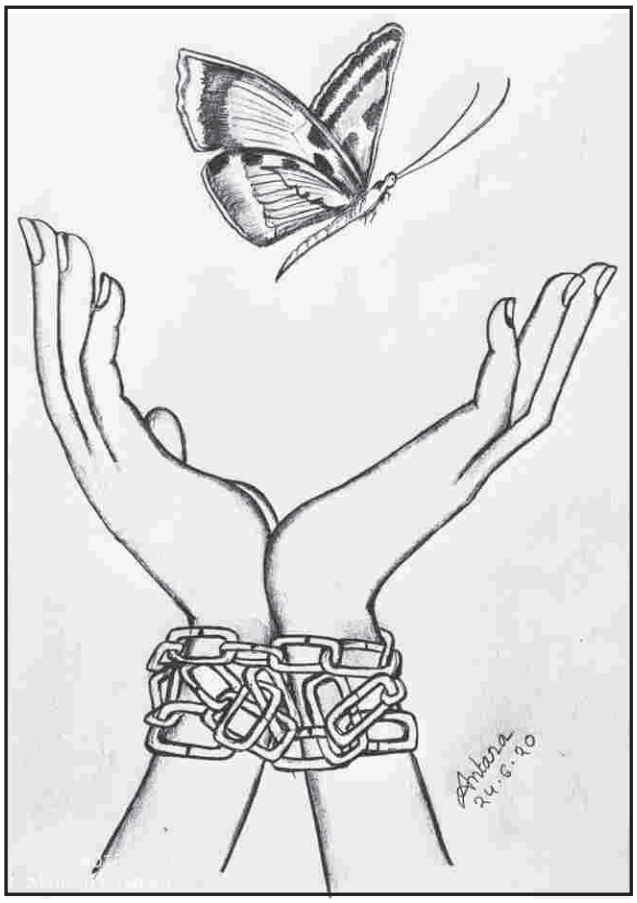

বর্তমান সময়ে বিদ্যাসাগরের প্রাসঙ্গিকতা

দেবারতি মাইতি, স্নাতকোত্তর, বাংলা বিভাগ, দ্বিতীয় সেমিস্টার

"অসতো মা সদগময়ঃ তমসো মা জ্যোতির্গময়ঃ
মৃত্যোমা অমৃতাঃগময়ঃ শান্তি ওম শান্তি।"

এক নিষণ্ণ বিষণ্ণ খিন্ন মহানায়ক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০, ২৬ শে সেপ্টেম্বর) যার পুণ্যাবির্ভাবের দ্বিশতবর্ষ আসন্ন (২০২০)। সেই শুভক্ষণের প্রাক্কালে দাড়িয়ে তাঁকে নিয়ে গবেষণা ও আলোচনা চলছে, গান বাঁধা হয়েছে, লেখা হয়েছে কবিতা। উনিশ-বিশ শতকে ও তার গবেষণা ও আলোচনা সত্ত্বেও একুশ শতকেও তার নামে অনেক মেলা, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার নাম রাখা হয়েছে।

"জীবনমরণের সীমানা ছাড়ায়ে,
বন্ধু হে আমার রয়েছ দাড়ায়ে।" – রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রকৃতপক্ষে জন্মের দুশো বছর পরে নয়, সমাজে যতদিন শিক্ষাভাব, দারিদ্র, মনুষ্যত্বের অবমাননা, নারীত্বের প্রতি উপেক্ষা থাকবে ততদিন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নাম স্মরণ করতে হবে। বৈপরীত্যের বিস্ময়কর সম্বন্বয়ের নাম বিদ্যাসাগর, করুণার সিন্ধু দীনবন্ধু যেন দয়ার সাগর।

"অন্ধকারের উৎস হতে জাগ্রত সে আলো
সে তো আমার আলো
সকল দ্বন্দ্ববিরোধ মাঝে জাগ্রত সে ভালো
সে তো আমার ভালো।" – রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আলো থেকে অন্ধকারে যতই যাওয়া যায় না কেন, তা ক্রমে ক্রমে আলোর দীপ্তি কমতে থাকে ক্রমশ, যা এক সময় আমাদের চোখে পড়বে না, ব্যতিক্রমী সূর্য। তেমনি এক উদ্যম ও কীর্তির অম্লান উদ্ভাস ব্যক্তিত্ব ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, তিনি আজও বাস্তবিক ও প্রাসঙ্গিক।

"মাঝে মাঝে বিধাতার নিয়মের এমন এক আশ্চর্য ঘটনা হয় কেন, যেখানে তিনি দু
কোটি বিশ্বকর্মা তৈরী করলেন সেখানে..." – চারিত্রপূজা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শিক্ষা তথা চেতনার দ্বারা সমাজকে মুক্ত করতে চেয়েছিলেন, তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, সমাজকে ও ধর্ম-বর্ন-জাতি নির্বিশেষে শিক্ষাস্তরে উন্নীত করতে না পারলে, কুসংস্কার, অজ্ঞতা, প্রভৃতি থেকে মুক্ত করতে পারবেন না।

তিনি মনে করেন না, শিক্ষা মানুষের অধিকার, যোগ্যতা, আত্মমর্যাদাবোধের দীপ্তিকে নিমজ্জিত করবে। বরং শিক্ষা থেকে দূরে থাকলে, নারীত্বের প্রতি উপেক্ষা, অপমান চিরকাল থাকবে। এ প্রসঙ্গে তিনি ব্যাখ্যা করছেন, 'সীতার বনবাস', 'বেতাল পঞ্চবিংশতি', 'শকুন্তলা' প্রভৃতিতে,–

"নগরপাল কহিলেন ... তুই যদি চুরি করিস নাই, তাহলে এ অঙ্গুরীয় পাইলে
কেমনে, রাজা কি সুব্রাহ্মণ বলিয়া তোমাকে দান করিয়াছে!"

বর্ণপরিচয় ও আখ্যানমঞ্জুরীতে লক্ষ্য করা যায় শিশুদের চরিত্র ও আচরনের প্রকাশ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সহজপাঠে' তাঁর সৃষ্টি বর্ণবিন্যাসের প্রতিভা লক্ষ্য করা যায়। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্বীকার করেন, "বিদ্যাসাগর মহাশয়ের গঠিত ও রচিত সম্পদ আমাদের মূলধন। আমরা কেবল তাঁর অর্জিত সম্পত্তি লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছি।"

স্ত্রী শিক্ষা সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে বিশেষ নজর দিয়েছিলেন। তিনি উপলব্ধি করেছেন প্রতিটি শিশুর ক্ষেত্রে তার মা-য়ের শিক্ষা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। প্রতিটি নারী সন্তান জন্ম দেন এবং সেই হাতে পৃথিবীকে শাসন করে। অর্থাৎ

সময় উত্তম আরোগ্যকারী ও উন্মোচক। অর্থাৎ 'Time is a great healer and revealer' একুশ শতকে দাড়িয়ে তাঁর শিক্ষার সমার্থ আমাদের বাস্তবায়িত করে তুলেছে। পুরুষ-নারী সকল নির্বিশেষে কাজী নজরুল ইসলাম বলেছেন বটে,–

"বিশ্বে যা কিছু মহান, যা কিছু কল্যাণকর
তার অর্ধেক করেছেন নারী, অর্ধেক তার নর।"

তিনি ঈশ্বর ও ধর্ম প্রসঙ্গে শিক্ষায়িত্রী মা-কে শ্রেষ্ঠ করে দেখিয়েছেন। প্রতিটি গর্ভজাত শিশু এবং অপমানিত, অত্যাচারিত নারী, উপেক্ষিত হয়েছে উপযুক্ত শিক্ষা থেকে।

অদৃষ্টের পরিহাস (Irony of fute) আর কাকে বলে!

"খাঁচাখানা দুলছে হাওয়ায়
তার মৃদু হাতের দোলায়।" – বলাকা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিদ্যাসাগর বুঝতে পেরেছিলেন, বিধবাদের একাকিত্ব ও বিষণ্ণতা তাদেরকে গ্রাস করে তুলেছে। লক্ষনীয় যে, বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে 'কুন্দনন্দিনীর' কথা, শরৎচন্দ্রের 'নারীর মূল্য' ও 'বড়োদিদি' গল্পে, 'দেবী চৌধুরানী', 'কৃষ্ণকান্তের উইল' ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'চোখের বালি' উপন্যাসে। আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী 'ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর' প্রবন্ধতে তিনি বলেছেন বিধবা বিবাহ আমার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'লোকহিত' প্রবন্ধতে তিনি উল্লেখ করেছেন,–

"স্ত্রী জাতিকে সাধবী রাখিবার জন্য সমস্ত সামাজিক শক্তিকে নারীর ওপর খাড়া করিয়া রাখিয়াছে। .... এতে নারীর হইতে পুরুষের সবচেয়ে ক্ষতি বেশি।"

বহুবিবাহ ও বাল্যবিবাহকে দেখিয়েছিলেন আধুনিক মনস্তত্ত্বের বিচারে। সকলের সুখে কুলুপ এটে রুখে দাঁড়িয়ে ছিলেন। সবাই তো আর বিদ্যাসাগর নন!

বাংলা গদ্যের উন্মেষ পর্বের সূচনাতে তাঁর অবদান অপরিহার্য। প্রবন্ধ ও গদ্য সাহিত্যের ধারাতে তিনি যথার্থ গৌরব দাবি করতে পারেন। ঋণ করেন না তিনি, ঋণী করেন তিনি সকল ভারতবাসীকে। বাংলা গদ্য ও ভাষা সাহিত্যে দাড়ি, কমা, পূর্ণচ্ছেদ, সেমিকোলন, বিরতিচিহ্ন, বিরামচিহ্নের ব্যবহার অসাধারণ। বাংলা ভাষাকে তিনি সুবিন্যস্ত, সুসংযত, সুশৃঙ্খল ও ছন্দস্রোতের আলোড়ন দান করেন। 'বাংলা গদ্যের যথার্থ শিল্পী'– রবীন্দ্রনাথের এই বিশেষ উক্তিটি বারবার স্মরণযোগ্য। তিনি ভাষার আড়ষ্টতা, দূরান্বয়ের অস্পষ্টতাকে এড়িয়ে সাহিত্যকে শ্রী দান করে ও সাহিত্যকে দিয়েছিলেন মাধুর্য।

সহস্রাব্দের মাঝে সেরা বাঙালি বিদ্যাসাগর তা নিয়ে কোন সংশয় থাকার নয়। কঠোরতা, উদারচেতা, মানবিকতা, উদারতা, সহানুভূতিশীল মানুষটির পোশাকে চটি ও সাদা কাপড় থাকলেও সেরা বাঙালির শিরোপাটি রাঢ়ী, কঠোর, কঙ্কাল বিশিষ্ট ছোটখাটো মানুষটির মাথায় দিতে হয়। যিনি সেনার রচনাকর্তা, যুদ্ধ জয়ের শিরোপাটি ভাষার কারিগর বিদ্যাসাগর মশায়কেই দিতে হয়। খাঁটি বাঙালি মানুষটি অর্জিত মূলধনের সাহায্যে শুধুমাত্র তাহার পুত্রের শিক্ষাদানের খরচ চালিয়ে নিতেন, কিছুই জমিয়ে রাখতে পারেন নি তিনি।

"বাংলার মাটি, বাংলার জল, বাংলার ফুল
পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, পুণ্য হউক হে ভগবান।"– রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এই বঙ্গদেশের ভূমিতে যেই মানুষটি জন্মেছিলেন, সেই মানুষটি বাংলার সমাজ সংস্কার, শিক্ষা, বিবাহ সংস্কারে, নানা ভাবে সমৃদ্ধ করেছেন। কখন ও ক্ষমতার ও ঐশ্বর্যের নিকট কখনও মাথা নোয়াতে পারেননি, সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠা থেকে বিভিন্ন উচ্চস্থ পদের কাছে নোয়াতে পারেননি কেউ, যিনি বাংলা ভাষা ও গদ্যকে গড়ে তুলেছিলেন 'অমরভাবজননী।' সেই খাঁটি বাঙালি মানুষটি সহস্রাব্দের মধ্যে হারিয়ে যাননি। যতদিন শিক্ষা, সমাজ, পাশ্চাত্য,

গণিত ও বিজ্ঞান, সংস্কার থাকবে তাহাকে প্রয়োজন ও সমধিক প্রাসঙ্গিক।

"... সেই উৎকট বেগবতী ইচ্ছা যা কখনও ক্ষমতার ও ঐশ্বর্যের নিকট মাথা নোয়াইতে পারেন নি।"

"... নাটকের প্রথম ও দ্বিতীয় দৃশ্য ভবভূতি প্রনীত উত্তরামচরিত থেকে পরিগৃহীত হইয়াছে।"

তিনি প্রতিটি সময় মনে করেন দৈহিক দণ্ডদান শিশুশিক্ষার জন্য ক্ষতিকর, এই মনোভাবটির মধ্যে সম্পূর্ণ মনোবিজ্ঞানসম্মত। এই খাঁটি বাঙালি মানুষটি সহস্রের মাঝে নিজেকে অনেকখানি কষ্ট দিয়ে একান্তরে চলে গিয়েছিলেন ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে।

"সকাতরে ওই কাঁদিছে সকলে শোন শোন পিতা
কহ কানে কানে শুনাও প্রাণে প্রাণে মঙ্গলবারতা।"

সকল ভারতবাসীর অখণ্ড ও অমানবিক, জর্জরিত সমাজে দানসাগর মানুষটির প্রাসঙ্গিকতা আমাদের ভাবায়, বিচলিত করে, আমাদের মনে এবং মননে চির অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে সহস্রাব্দের সেরা বাঙালি মানুষটি। 'বোধোদয়', ও 'বর্ণপরিচয়', 'কথামালা' প্রভৃতির মধ্যে দিয়ে থাকবে তার সৃষ্টি ও স্রষ্টার ঋণ। ভারতবাসীর মধ্যে, এই প্রাসঙ্গিকতা ও প্রাচুর্যতা চিরস্মরণীয়।

"ধন ধান্য পুষ্পে ভরা, আমাদেরই বসুন্ধরা
তাহার মাঝে আছে দেশ এক সকল দেশের সেরা"

মনি

বন্দনা দাস, প্রাণীবিদ্যা, এম.এস.সি., ৪র্থ সেম.

বিজ্ঞান বিভাগে পড়ার খুব ইচ্ছে পিয়ালীর। তাই সবং কলেজে ইংরেজি অনার্স পেয়েও সে ভর্তি হয়নি। অবশেষে তার মনস্কামনা পূর্ণ হয়। রাজা নরেন্দ্রলাল খান মহিলা মহাবিদ্যালয়ে প্রাণীবিদ্যা সাম্মানিক বিভাগে ভর্তি হয়।

সালটা ২০১৫, ২৩ শে জুলাই। প্রথমদিন পিয়ালী বাবার সাথে কলেজে আসে। দিশা বাসের কনডাক্টার বলেন– এই যে এইখানে নামুন। উল্টোদিকে মহিলা কলেজের গেট। বাস থেকে নেমে পিয়ালী দেখে কলেজের সামনে বিশাল জনসমুদ্র। বাপবেটিতে একসাথে কলেজের গেটে প্রবেশ করে। পেছন থেকে দারোয়ান চেঁচিয়ে ওঠে– এই যে আপনি, ভেতরে যাবেন না, মেয়েকে একাই যেতে দিন। বামদিকে গিয়ে সোজা ডানদিকে ঘুরে যাও, ঐ যে অডিটোরিয়াম হলে চলে যাও।

বলে দারোয়ান পিয়ালীকে অঙ্গুলি নির্দেশ করল। বিষণ্ণ পিয়ালী এবার বাবার হাত ছেড়ে একা ভয়ে ভয়ে জনসমুদ্রে মিশে গেল।

এক বিরাট অডিটোরিয়াম হল। একতলা, দোতলা বসার জায়গা সব ভর্তি। তাই পিয়ালী দূরে দাঁড়িয়ে অনুষ্ঠান দেখল। মঞ্চে ছিপছিপে গড়নের, টুকটুকে ফর্সা, লম্বা সালোয়ার কামিজ পরা চল্লিশ ঊর্ধ্ব বয়সের এক ম্যাডাম কলেজের সম্বন্ধে ছাত্রীদের পরিচয় দিচ্ছেন। সঙ্গে সঙ্গে পাশে পর্দায় ছবি দেখাচ্ছেন– পুরোনো রাজবাড়ি, আস্তাবল, রাজা নরেন্দ্রলাল খান ও কলেজের উন্নয়নের নানা ছবি, উনি হলেন সবার প্রিয় রূপা ম্যাম।

অনুষ্ঠান চলতে চলতে পিয়ালীর চোখ পড়ল মঞ্চের এক কোনে কুচকুচে কালো, জট ধরা অগোছালো চুলের, বিবর্ন ফ্রক পরা একটা মেয়ের দিকে। বয়স ঐ এগারো কি বারো হবে। কি করছে ঐ বাচ্চা মেয়েটি ওখানে ? ভাবছে পিয়ালী। অনুষ্ঠান শেষে সবাই যে যার বিভাগে গেল। কোনো ক্লাস হল না প্রথম দিন। স্যার ম্যামদের সাথে কেবল পরিচয় হল।

পিয়ালী হোস্টেল পেয়েছে কিনা জানার জন্য অফিসের দিকে গেল। দেখে কৃষ্ণচূড়া, রাধাচূড়া, জবা, নীলকাঞ্চন, গোলাপ কত রঙ বাহারি ফুলের গাছ রাস্তার দুপাশে। বড়ো গাছের মধ্যে জাম, দেবদারু, বেল, কাঁঠাল, আম, নারিকেলও রয়েছে। জামগাছের তলায় শুকনো পচা জাম গালিচার মতো বিছানো রয়েছে। টিয়া, শালিক, চড়ুই, সাতভাই চম্পা কত নাম না জানা পাখি কিচিরমিচির শব্দে কলেজ প্রাঙ্গন মুখরিত করে রেখেছে।

হোস্টেল না পাওয়ায় পিয়ালী রোজ যাতায়াত করেই কলেজে আসে। রোজের মাছ, আরশোলা, শামুক কাটা প্রাক্টিক্যাল আর থিওরি ক্লাস করেই এক বছর কেটে যায়। একদিন পিয়ালী সায়নীর সঙ্গে ক্যান্টিনে যায় চপ কিনতে। তখন একটা বাজে ঘড়িতে। পিয়ালী মুড়ি-ঝুরি আনে। তাই তার ক্যান্টিন যাওয়ার খুব একটা প্রয়োজন হয় না। গিয়ে দেখে সঙ্গীত বিভাগের ম্যাডাম চেঁচিয়ে বলে– মনি, তাড়াতাড়ি ভাত দে, ক্লাস আছে, থালার উপর শালপাতাটা দিবি। আর কাঁচালঙ্কা, আর পিঁয়াজ দিতে ভুলিস না যেন।

– হ্যাঁ, দিদিমণি, ওপার থেকে প্রত্যুত্তর দিল মনি। পিয়ালী ভাবে এই সেই মেয়ে ? যে প্রথম দিন মঞ্চে এক কোনায় দাঁড়িয়েছিল ? নাম তার মনি ?

ক্যান্টিনের ম্যানেজার বলে– মনি, স্যার বসে আছে। চিকেন রোলটা শিগগির দিয়ে আয়।

– হ্যাঁ আসছি।

মনি, রবীন্দ্রনীড়ে, সেমিনার হচ্ছে, মনে করে চা বিস্কুট দিয়ে আসবি।

– হ্যাঁ মনে আছে।

একের পর এক হুকুম খেটেই চলেছে মনি সকাল আটটা থেকে সন্ধ্যে ছয়টা অব্দি। না হয় দুবেলা সঠিক সময়ে

দুমুঠো ভাত খাওয়া, না পায় ভালো পোশাক, না পায় শিক্ষা, না পায় কোনো অধিকার।

ইতিমধ্যে পিয়ালীর বিয়ে হয়ে যায়। দূর থেকে আরও দূরে চলে যায় তার ঘর। কলেজ থেকে ঘরের দূরত্ব প্রায় একশো কিমির মতো। তবুও সে হার মানেনি। স্বামী-শ্বশুর মশাই-এর অনুমতি নিয়ে স্বপ্নপূরণে তার লক্ষ্য স্থির। রোজ যাতায়াত করেই পড়াশুনা চালিয়ে যায় নিরলসে। উচ্চশিক্ষা লাভ করে নিজে স্বাধীন হতে যায়। গরীবের মুখে দুমুঠো অন্ন জোগাতে চায়।

সেদিন সঙ্গীত বিভাগের পাশ দিয়ে অফিসে চা দিতে যাওয়ার সময় মনি গুনগুন করে গেয়ে ওঠে– "তুমি নির্মল কর, মঙ্গল কর, মলিন মর্ম মুছায়ে, তব পুন্য কিরন, দিয়ে যাক মোর, মোহ কালিমা ঘুচায়ে।" পিয়ালী 'কন্যাশ্রী'র জন্য সাগরিকা ম্যাডামের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল। অফিস থেকে বেরিয়ে আসার পথে মুখোমুখির মনির সাথে দেখা।– মনি, তুমি তো খুব সুন্দর গান গাও!

– না, না, এমনি বলেই মনি ফিক করে হাসল। পিছন থেকে সাগরিকা ম্যাম হাঁক দেয়– মনি, কী গল্প করছিস ? শিগগির চা টা দে। তিনটে বেজে গেল যে। বেচারা দৌড়ে চলে গেল।

পিয়ালীর এখন তৃতীয়বর্ষ। তাই অনেকদিন মনির সাথে দেখা হয়নি, ক্লাস আর প্রাকটিক্যাল-এর চাপে। ৪.১৫ তে আজ ক্লাস শেষ। কলেজ বাস বিকাল ৫.১৫ তে। তাই পিয়ালী বোতলে জল ভরে, বাথরুম সেরে, বাবাকে ফোন করল– বাবা, আজ ফিরতে সন্ধ্যে হবে, সাতটার দিকে বাসট্যাণ্ডে থাকবে। এমন সময় পিয়ালী দেখে মনি কুকুরছানাগুলোর কলক্রীড়া দেখছে। পিয়ালী ডাকে– মনি, অ্যাই মনি শোনো।

মনি দেখে, শাড়ী পরা কে একজন ডাকছে, সে গেল পিয়ালীর কাছে, বলল–কী ?

– বসো আমার কাছে।

খানিকটা হতভম্ব হয়েই মনি পিয়ালীর পাশে বসল।

– বাড়ীতে কে কে আছে তোমার ?

মা, বাবা আর আমরা পাঁচ বোন ও দুই ভাই।

– পড়াশুনা করো না কেন ?

আমি সেভেন অব্দি পড়েছি। আর ওসব মোর দ্বারা হবেক লাই।

– কেন হবে না ?

বাপটা মাতাল, মা টা মোর সারাদিন মাঠে খাটে। ভাই বোনগুলা ছোট্টো। আমি পড়লে সংসার কে দ্যাখবে ?

– মাইনে কত পাও ?

সাতশ টাকা।

– তুমি স্কুলে ভর্তি হয়ে যাও। অনগ্রসর জাতির ছাত্রছাত্রীদের পড়াশুনার জন্য সরকার টাকা দিচ্ছে। মিড-ডে মিল দিচ্ছে। তবে কেন তুমি পিছিয়ে থাকবে ? এই কলেজে কত মেয়ে পড়তে আসে, তুমি তাদের খাবার পরিবেশন করে তাদের লক্ষ্যে পৌঁছোতে সাহায্য করে চলেছো। কেন তবে নিজে নিজের পায়ে দাঁড়াবে না ? পরের অধীনে কম বেতনে কেন কাজ করবে ? কেন ঠকবে প্রতিপদে শিক্ষার অভাবে ?

হ্যাঁ, কিন্তু আমি পড়তে গেলে মোর ভাই বোনগুলার কী হবেক ?

– প্রিন্সিপাল ম্যাম তো কিছু বাচ্চাদের ভরণপোষণের দায়িত্ব নিয়েছে। আমি না হয় ম্যামকে বলব।

– দিনিমনি, তুই মোর লাগি এত ভাবিস ?

মনি পিয়ালীকে দিদিমনি ভেবেছে। পিয়ালী শ্বশুর বাড়ীর নিয়ম মেনে রোজ শাড়ী পরে কলেজে আসে তাই।

– ধুর পাগলী। আমি দিদিমণি নয়, এ কলেজের ছাত্রী। আর তুমি আজ থেকে আমায় শুধু দিদি বলেই ডাকবে।

দিদি... তুমি আমার দিদি, বলেই মনি পিয়ালীকে জড়িয়ে ধরে অঝোরে কাঁদতে লাগল।

বাংলা ভাষা সাহিত্য ও চিকিৎসাক্ষেত্র

শ্রাবণী মাহাতো, এম.এ., চতুর্থ বর্ষ

"ধনধান্য পুষ্পে ভরা
আমাদের এই বসুন্ধরা"

পুষ্প এবং বৃক্ষাদি নিয়ে গঠিত আমাদের এই দেশ ভারতবর্ষ। তারই মধ্যে এই রাজ্যে পশ্চিমবঙ্গ এই পশ্চিমবঙ্গের প্রধান ভাষা বাংলা। বাংলা ভাষা পশ্চিমবঙ্গের প্রধান ভাষা হলেও পশ্চিমবঙ্গের বাইরে এর সেরকম গুরুত্ব না থাকায় অনেক সমস্যার সম্মুখীন আমাদের এই রাজ্যবাসীকে হতে হয়। এইজন্য আমাদের প্রত্যেককে একজন বাঙালি হওয়ার সুবাদে বাংলা ভাষা যেমন জানার দরকার হয় তেমনি ইংরেজী এবং হিন্দি ভাষারও চর্চার ও আগ্রহের তাগিদ অনুভব করা হয়। তার জন্য অন্যান্য ভাষার সঞ্চার করতে হবে।

"চঞ্চলেরও বিহ্বলতার নিজেরও অপমান"

একজন পশ্চিমবঙ্গবাসী হিসেবে প্রত্যেকে যদি তাদের জ্ঞানের ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করে, তার জন্য নিজের কোনো অপমান হয় বরং নিজেকে সকল ভাষাভাষী মানুষের কাছে যোগ্য বলে মনে হবে।

এই প্রসঙ্গে দেখতে গেলে চিকিৎসাক্ষেত্রে ভাষা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পশ্চিমবঙ্গের বাইরে ব্যাঙ্গালুরু, দিল্লি, মুম্বাই, ওড়িষ্যা, অন্ধ্রপ্রদেশ ইত্যাদি রাজ্য চিকিৎসা ব্যবস্থা সমৃদ্ধ হওয়ায় সেখানে ভাষার সমস্যা দেখা দেয়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'মুক্তধারা' নাটকে মানবসভ্যতার সঙ্গে যান্ত্রিক সভ্যতার মেলবন্ধন ঘটিয়েছেন।

রাজা রামমোহন রায় নারীদের সতীদাহ প্রথা বিধবাবিবাহ এগুলি প্রত্যক্ষ করেছিলেন।

মহাশ্বেতা দেবী তিনি দরিদ্রতা লক্ষ্য করেছিলেন বলে দ্রারিদ্রকে তিনি 'ভাত' ও অন্যান্য অনেক গল্প রচনা করেছিলেন।

বিবেকানন্দ শিকাগোতে গিয়ে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বিভেদটা অনুভব করেছিলেন বলে তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য প্রবন্ধটি লিখেছিলেন।

শেক্সপীয়র 'কিংলিয়র' নাটকটি লিখেছিলেন যাতে করে আমাদের বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে ইংরেজী সাহিত্যের মেলবন্ধন ঘটাতে পারেন।

এগুলি প্রত্যেকটি বাংলা ভাষার সাহিত্য। এইজন্য পাঠকের অন্যান্য ভাষার প্রতি যাতে আগ্রহ বাড়ে এজন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।

ড. বিধান চন্দ্র রায় বিনামূল্যে চিকিৎসা করেছিলেন। আগে কলেরা, ম্যালেরিয়া ও প্লেগ রোগেও মানুষ মারা যেত। রবীন্দ্রনাথের চিকিৎসা করতেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বাংলা ভাষার সঙ্গে চিকিৎসাব্যবস্থা বাংলা ভাষাটিকে যুক্তিসম্মত ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন।

স্যার আইজ্যাক নিউটন বৈজ্ঞানিক সূত্রপাত করেছিলেন। গাছের প্রাণ আছে, আচার্য জগদীশচন্দ্র একথা প্রমাণ করেছিলেন। বেঙ্গল ক্যামিক্যাল প্রফুল্ল চন্দ্র রায় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাছাড়া ডারউইন, গ্যালিলিও, চাণক্য, সুশ্রুত, বাণভট্ট, কোপারনিকাস, আর্কিমিডিস, ঋত্বিক ঘটক, মহাশ্বেতা দেবী ও বিজন ভট্টাচার্যের ছেলে নবারুণ ভট্টাচার্য প্রমুখদের সাহিত্য চর্চা থেকে বোঝা যায় সাহিত্যের সঙ্গে চিকিৎসাব্যবস্থার কোথাও একটা যোগসূত্র প্রাচীনকাল থেকে রয়েছে।

এইভাবেই আমি একজন পশ্চিমবঙ্গবাসী বাঙালি হয়ে প্রত্যেকটি কলেজে যাতে করে সাহিত্যের সঙ্গে চিকিৎসা বিষয়ে যোগসূত্র বিষয়ে পাঠদান করা হলে খুবই ছাত্রছাত্রীরা দক্ষ হয়ে উঠতে পারবে এবং পরবর্তীতে যাতে

কোনো কাজে চাকরিতে (বেসরকারি ও সরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে) সকল মানুষ সাহিত্য ও চিকিৎসা নিয়ে পড়তে আগ্রহী হয়ে প্রত্যেক বাঙালি পাঠকের এটি একঘেয়েমি না হয়ে উঠে তার জন্য সমস্ত রকম ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। পাঠককে জোর করে নয় পাঠক যাতে ভালোবেসে এই বিষয় গ্রহণ করে তাতে করে দায়িত্বভার প্রাপ্ত ব্যক্তিদের উপযুক্ত ব্যবস্থা অবশ্যই দরকার এতে করে আমার মনে হয় বাঙালি মানুষ অনেক নতুন কিছু জানতে পারে ও বাংলা সাহিত্যের ভাণ্ডারও সমৃদ্ধ হবে।

আধুনিক সমাজে নারী

শ্রেয়সী মিশ্র, পদার্থবিদ্যা অনার্স

"নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার
কেহ নাহি দিবে অধিকার
হে বিধাতা ?" – সবলা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আমাদের সমাজে এ প্রশ্ন নানা অভিঘাতে বারে বারে ঘুরে ফিরে এসেছে। কিন্তু সমাজে নারীর মূল্য কতখানি পরিবর্তিত হয়েছে ? যুগ, সময়, মানব ও জাতি দিনে দিনে সুসভ্য আধুনিক হয়ে উঠেছে কিন্তু পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতি অর্থাৎ নারীজাতির তেমন কোনো পরিবর্তনই হয়নি।

জল আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয়, অথচ তার দাম নেই। কিন্তু কখনও জলের একান্ত অভাবে মনিমাণিক্যের বিনিময়েও একফোঁটা জলের প্রত্যাশী হব আমরা। সমাজে নারীর অবস্থাও ঠিক জলেরই মতো। কোনোদিন সংসারে নারী বিরল হয়ে পড়লে নারীর যথার্থ মূল্য কত, সে তর্কের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি পাওয়া যাবে।

আমরা যতই মুখে বলি না কেন, নারী-পুরুষ সমান সমান বা সংবিধানে যতই নারী পুরুষের সমানাধিকার স্বীকৃত হোক না কেন কোথাও না কোথাও আজও নারীরা চূড়ান্ত অবহেলিত ও অমর্যাদাকর জীবনযাপনই করছে। প্রাচীন কালে ঠিক যে সময় থেকে সমাজে নারী-পুরুষ বিভাজন হয়েছে, তখন থেকেই নারীর উপর পুরুষের আধিপত্য কায়েম হয়েছে। অশিক্ষা, অজ্ঞতার অন্ধকারে নিমজ্জিত থেকেছে বহুকাল, থেকেছে পর্দানসীন অসূর্য মনস্যা হয়ে। সমাজ-সংসার জুড়ে সর্বত্রই নারীদের পুরুষের হাতের ক্রীড়নক করে রাখার ব্যর্থ প্রচেষ্টা চলে আসছে যুগ যুগ ধরে।

বর্তমানে নারী শিক্ষার প্রসার ঘটেছে কিছুটা। আধুনিক নারী, পুরুষের সঙ্গে সমানতালে ছন্দ মিলিয়ে ঘরে ও বাইরে নিজের যোগ্যতার প্রমাণ রেখেছে। গৃহবধূ থেকে রাষ্ট্রমন্ত্রী সব জায়গাতেই নারী সফলতার সাক্ষ্য প্রমাণ রেখেছে। তবু আধুনিক সমাজের সর্বস্তরে আজও নারীরা অবমাননার শিকার। মানবতাবোধ কোথায় যেন হারিয়ে গেছে পুরো সমাজের। আজও স্বনির্ভর অবিবাহিত চেয়ে পরনির্ভর সালঙ্কারা বধূরূপই পিতা-মাতার কাম্য। আজও দাদারা পিতৃসম্পত্তি থেকে বোনকে নির্দ্বিধায় বঞ্চিত করে। সন্তান সম্ভবা মা পুত্র সন্তানের জন্য মানত করেন। বিধবা-বিবাহ সমাজ-স্বীকৃত হলেও বিধবার বিবাহকে সমাজ আজও বাঁকা চোখেই দেখে। তাই স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে নারীকেই হতে হবে অগ্রণী। তাই এই লড়াইয়ের মূল অস্ত্র হল শিক্ষা, উচ্চতর নারী-শিক্ষা, সমাজে মানসিকতার পরিবর্তন করতে নারীর মনোবল দৃঢ় করতে শিক্ষার ভূমিকাই সর্বাধিক।

আধুনিক নারীকে 'সবলা'র মতোই দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করতে হবে–

"হে বিধাতা আমারে রেখো না বাক্যহীনা–
রক্তে মোর জাগে রুদ্রবীণা।"

সম্পর্কে গাছ

তিয়াশা মণ্ডল, পদার্থবিদ্যা অনার্স, ২য় সেম.

আজ ক্লাসে একটা উদ্ভট ঘটনা ঘটে যাওয়ায় আমার মাথায় এখনো ব্লাস্ ফার্নেসের আগুন জ্বলছে। না-না উদ্ভট জিনিসটি বিশেষ কিছুই না কিন্তু বিশেষ কিছুই। আমার ক্লাসের ছেলে-মেয়েদের গাছ সম্পর্কে লিখতে দেওয়ার ফল। ওহ্ আমি আপনাদের আমার পরিচয় দিতেই ভুলে গিয়েছি। আমি গোপীগড়পুর সেক্টর হাউস ০০৮৩২ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মিনি সিক্স ক্লাসের হোমরুম টিচার এবং ম্যাক্সি থার্টিনের হেড প্রোফেসর, নাম-টি. ০৬৩২ এম.। আমার বয়স ৬৩২ বছর। অবাক হচ্ছেন আমার নাম আর বয়স শুনে। আমার জন্ম ২০০২ সালে আর এখন বর্তমান সাল ২৬৩৪। জন্মের পর আমার নাম দেওয়া হয়েছিল তিয়াশা মণ্ডল, কিন্তু বর্তমানে আমার নাম তিয়াশার 'টি' আর মণ্ডলের 'এম' এর মধ্যে আমার বয়স ৬৩২। আমার কথা আপনাদের মেন্টালি ডিস্টার্ব পেসেন্ট এর মতো মনে হচ্ছে, তাই তো ? তাহলে আমি একটু বিষদে বলি।

আমার নাম তো আপনাদের বললাম। আসলে বিগত কয়েক শ' বছর ধরে পৃথিবীতে, না-না শুধু পৃথিবীতে নয় আমাদের সৌরজগৎ, স্যান্টিমা জগৎ, ডাইমণ্ড জগৎ ইত্যাদি আরো নানান জগৎ এর পরিবর্তন ঘটেছে। আজ আমি আমাদের সৌর জগৎ এর পৃথিবীর কথাই শুধু বলবো। পৃথিবীতে ৬৩২ বছর ধরে শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান, ভাষা সব কিছুতেই আমুল পরিবর্তন ঘটেছে। পরিবর্তন হয়নি শুধু স্টুডেন্টদের অবস্থার। 2020 সালের শিক্ষক এবং প্রোফেসরদের যে ঝামেলা পোহাতে হত এখনো তাই হয়। বিগত ছয় শতাব্দি ধরে পৃথিবীর 'মানুষ' জাতি, বৃহস্পতির 'বি.এইচ. 32' জাতি, শনি এর 'এস.এন. 300 এক্স.ওয়াই.' জাতি, আর বুধ এর 'বি.ডি. 09 IV' জাতি সৌর জগৎ এর উন্নতি ঘটিয়েছে। এখন প্রতিটি গ্রহের সঙ্গে গ্রহের জীবেদের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হয়েছে। যাতাযাত ও যোগাযোগ বেড়েছে সৌরজগৎ এর আভ্যন্তরীণ গ্রহ ও বিভিন্ন বহিঃজগৎ এর সঙ্গে। কালযাত্রা বা টাইম ট্রাভেলও বেড়েছে। বিজ্ঞানের উন্নতির সাথে ভাষারও উন্নতি ঘটিয়েছে মানুষ। আমার ঠিক উন্নত ভাষা বলাটা ঠিক নয়, বলা যেতে পারে তথা কথিত উন্নত। আমাদের পৃথিবীতে বর্তমানে এক কোটির বেশী স্থানীয় ও আঞ্চলিক ভাষা স্বীকৃতি পেয়েছে। আন্তর্জাতিক বা রাষ্ট্রীয় ভাষা বলতে আর কিছুই নেই। ল্যাঙ্গুয়েজ ট্রান্সলেটর পিল (এল.টি.পি.) বেরিয়েছে, যা আসলে এমন একটি পিল বা বড়ি যা মুখে দিয়ে কথা বললে আপনি আপনার কথা আপনার বিপরীতে থাকা ব্যক্তির ভাষা বলতে ও শুনতে পারেন। না-না এই পিল জৈবীক নয়, এটা যান্ত্রিক পিল। এই পিলের ব্যবহার সর্বক্ষেত্রে স্বীকার্য তাই এখন আর স্টুডেন্টদের অন্য ভাষা শিখতে হয় না, তারা সবাই বাংলাতেই কথা বলে। সাহিত্য ও ভাষা আন্দোলনের ফলে আমাদের ভাষার এই পরিবর্তন। অন্য ভাষা ব্যবহারও নিষিদ্ধ প্রায়। এখন আপনারা ভাবছেন যে আমি কেন ইংরেজী, রোমান শব্দ ব্যবহার করছি ? আসলে ২০১০ সালের আগেই আমরা বাংলা ভাষার বলার ও লেখার পরিবর্তন ঘটিয়েছি। বাংলা শব্দের মধ্যে ইংরেজী, রোমান, সংস্কৃত, আরবি, ফারসি ইত্যাদি বিভিন্ন ভাষার শব্দ জুড়ে কথা বলা আমাদের বিংশ শতাব্দির শুরু আগের অভ্যাস। তাই এইসব ভাষাকে পুরোপুরি বাদ দিয়ে বিশুদ্ধ বাংলা সম্ভব নয়। তাই বাংলার সাথে অন্য ভাষা জুড়ে কথা বলা বা লেখা স্বীকার্য ও সর্বত্র গ্রহণযোগ্য। তবে লেখার সময় অন্য ভাষার শব্দের উচ্চারণকে বাংলা বর্ণমালার প্রয়োগেই লিখতে হবে। আপনাদের আমি বর্তমান জীবন সম্পর্কে বলি। ইমমর্টাল পিল বা সঞ্জীবনী আবিষ্কার হওয়ার পর মানুষ আর মারা যায় না। মানুষ না মারা গেলে, থাকার জায়গার অভাবের কথা ভেবে নবজাত শিশুর খাওয়া ও বাসস্থানের অভাব হবে বলে বিজ্ঞানীরা এর ফলও বের করেছেন। সঞ্জিবনীর সাথে পুনর্জীবনী বা এজ রিপিটেড ডোজ পঞ্চাশ বছর ছাড়া একবার দেওয়া হয়। এই এজ রিপিটেড পঞ্চাশ বছর বয়সের পর থেকে মানুষের বয়স কমাতে থাকে; উনপঞ্চাশ, আটচল্লিশ, সাতচল্লিশ এই ক্রমে।

আবার বয়স কমে এক বছর হলে এই ডোজ এর ব্যবহার করে পুনরায় বয়স বাড়ায়। এখন মানুষের সর্বোচ্চ বয়স পঞ্চাশ বছর। জলচক্র, বায়ুচক্র এর মতো বয়সও এক থেকে পঞ্চাশ অব্দি ঘুরতে থাকে বার বার আর সাথে সাথে বয়স অনুপাতে মানুষের উচ্চতা, আয়তন সবকিছুই পরিবর্তন হয়। এর ফলে নতুন করে নবজাত এর প্রয়োজন হয় না, তাই নবজাত এর জন্মের ওপর আইন করে রোধ আনা হয়েছে। পঞ্চাশ বছর এর পর যখন আপনার বাবা-মা এর বয়স কমতে থাকলে তখন আপনার বয়স বাড়তে থাকবে। বয়স যখন কমবে তখন বয়স কমার সাথে সাথে মস্তিষ্কের ক্ষমতা কমতে থাকে শুধুমাত্র স্মৃতিশক্তি বাদ দিয়ে। এতকিছু বলার পর আপনারা আমার সুডেন্দের স্যাণ্ডার্ড সম্পর্কে বুঝতে পারবেন। আমার সুডেন্ড ব্যাচ মিনি সিক্স এর অর্থ হল এই যে তারা সিক্স স্যান্ডার্ড অর্থাৎ ষষ্ঠ শ্রেনীর ছাত্র আর মিন এর অর্থ হল তারা নবজাত। আপনারা নবজাত শুনে অবাক হচ্ছেন জানি, জন্ম বন্ধ হয়ে গেছে বর্তমানে, এটা ঠিকই কিন্তু, ঘটনাটি হল এই যে, এজ রিপিটেড পিল সম্পর্কে ভাবনা চিন্তা ও আবিস্কার ২৩৫০ সালে হয়েছে অর্থাৎ মাত্র ২৮৪ বছর আগে। ২৩৫০ সালের আগে অবধি বয়স কমতো না, বয়স বেড়েই যেত। আপনাদের বোঝার সুবিধার জন্য বলি– আমার মিনি সিক্স ব্যাচ এর সুডেন্দের বয়স ২৪২ থেকে ২৪৫ বছর। এরকমই ম্যাক্সি থার্টিন ব্যাচ এর সুডেন্দ মানে তাদের বয়স তুলনামূলক বেশী। এই ব্যাচের ছাত্রদের বয়স ৫৬৭-৫৭০ বছর এর মধ্যে।

এখন আপনাদের আসল কথাটি বলি– আমার মাথায় আগুন জ্বলার কারণ। আমি আমার মিনি সিক্স ব্যাচের সুডেন্দের হোমরুম টিচার অর্থাৎ আমি তাদের সমস্ত বিষয়ই পড়াই সাহিত্য থেকে বিজ্ঞান সবকিছুই। আমি আজ তাদের পরিবেশ ক্লাস করানোর সময় গাছ সম্পর্কে রচনা লিখতে বলেছিলাম। তাদের রচনার কিছু লাইন হল এইরকম– গাছ হল এক বিশেষ প্রকার অক্সি.ও.এন. ৩০ এর মতো যন্ত্র যা অক্সিজেন সরবরাহ করে; গাছ হল হোমমেড ৩৫১ এক্স রোবট এর মত মেশিন যা বাতাসকে বিশুদ্ধ করে; গাছ হল এয়ার ফ্রেগনেন্স কোম্পানীর তৈরী ফ্রেটনেন্ট টি.২.ডি. যা বাতাসকে সুরভিত করে। এবার আপনারাই বলুন এই সব কথা শুনে আপনাদের মাথা জ্বলবে কি-না ? আসলে বর্তমানে আর গাছ নেই, উদ্ভিদ জাতী পুরোপুরি বিলুপ্ত যন্ত্র যুগে। গাছ নেই এখন নয়, তা আজ থেকে ৫০০ বছর আগের কথা। জন্মহার বৃদ্ধি ও অমরত্ব প্রাপ্তির জন্য বাড়ি-ঘর এর জায়গার অভাব হওয়ায় গাছ কেটে ফেলা হয়েছে।

আর গাছের বিকল্পে এসেছে যন্ত্র। যা আমাদের গাছের প্রয়োজন মিটিয়েছে। তাই সুডেন্রা গাছের উপকারিতা জেনে গাছকে নিজেদের মতো করে আকার ও আকৃতি দিয়ে মৃতবৎ-জড়বৎ যন্ত্র করে তুলেছে।

এই সব দেশে শুনে আমি ভাবলাম যে এসব আমার আপনাদের জানানো প্রয়োজন যদি আপনারা কিছু সাহায্য করতে পারেন, তাই লিখতে বসলাম।

বাস্তবতা

মৌমিতা দাস, অর্থনীতি বিভাগ, দ্বিতীয় বর্ষ

আমরা অনেকেই দেখেছি যে একটা গাছের ঠিকঠাক বাঁচার জন্য, বেড়ে ওঠার জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণে আলো, বাতাস, মাটি এবং খোলা পরিবেশ লাগে।

কিন্তু প্রাকৃতিক পরিবেশের এই উপাদানগুলি গাছ যদি না যথার্থভাবে পায়, তাহলে হয়তো সে না ঠিকভাবে বড়ো হবে না ঠিকভাবে বেড়ে উঠবে।

আমাদের জীবনেও ঠিক এমনই কিছু দরকার বেঁচে থাকার জন্য, বেড়ে ওঠার জন্য।

এক শিশু মায়ের গর্ভের সবচেয়ে নিরাপদ স্থান থেকে বেরিয়ে আসার পর থেকেই শুরু হয় যুদ্ধ, এ যেন এক বাঁচার যুদ্ধ। এই শিশুর প্রথম পরিবেশ হল তার পরিবার যা তার বাবা-মা এবং বাকি সদস্যদের নিয়ে গঠিত। এই পরিবেশকে পরিবারের সমস্ত সদস্যরা হাসিখুশি, অহিংসা, স্বাধীনতা, সততা, ভালবাসা, স্নেহের মতো উপাদান দিয়ে বেঁধে রাখলে তবেই বাড়ির ছোটোরা এমনকি নিজেরাও ভালো থাকবে এবং সুস্থ থাকবে। এটা প্রমাণিত যে হাসিখুশি ও ভালবাসা দিয়ে তৈরী পরিবেশ শারীরিক ও মানসিক অসুস্থতা কমায়।

কিন্তু এগুলো করে ক'জন আর ভাবেই বা ক'জন কিছু পরিবার আছে যারা হয়তো শুরু করতে চায় এক ভালবাসার চাদরে মোড়া পরিবেশ গড়তে কিন্তু সেটা হয়ে যায় কিছু দিনের জন্য। বর্তমান জীবনে ছেলে হোক বা মেয়ে প্রত্যেকেরই নিজের একটা পরিচয় হওয়া দরকার। কিন্তু এই পরিচয় গড়ার পথে যদি শত্রু হয়ে দাঁড়ায় নিজের পরিবার। যদি পরিবারে দিনদিন বাড়তে থাকে অশান্তি, দ্বন্দ, কলহ, হিংসাত্মবোধ, অহিংসার বংস হয় আর শুরু হয় শত্রুতার। যদি শুরু হয় এক প্রতিযোগিতা, জীবন নামে ছোট্টো প্রাণটুকু বেরোনোর অপেক্ষার। আর তারি মাঝে যদি বেড়ে ওঠে সন্দেহ অর্থহীনতা– এগুলোকে কাটিয়ে মাথা উঠিয়ে বাঁচা কী খুব সহজ ? নিজের পরিচয় গড়ে তোলা কী সহজ ? হয়তো এই প্রশ্নগুলোর অর্থ কেউ বুঝবে না বা হয়তো বুঝবে মধ্যবর্তী পরিবারে জন্মানো মেয়েটা। যাকে সারাদিন পরিবারের সাথে, পরিবেশের সাথে লড়াই করার পর দিন শেষে সহ্য করতে হয় নিঃসঙ্গতার, মানসিক ও দৈহিক অসুস্থতার, যার মনের মধ্যে থাকা গভীর সংকল্প রাতের গভীর অন্ধকারে একটু একটু করে ক্ষীণ হয়ে যায়; তারাই হয়তো বুঝবে।

তাই পরিবার গড়ার আগে সকলকেই পরিবেশ গড়তে জানতে হবে, বুঝতে হবে বাস্তবতা।

প্যারানরমাল এক্সপার্ট

সম্পিতা বাগ, ইউ.জি., ২য় সেম.

আজ সকাল থেকেই অল্প অল্প বৃষ্টি হয়ে চলেছে। থামার কোনো লক্ষণ নেই। আর এদিকে সুভাষবাবু চিন্তায় মগ্ন হয়ে বইয়ের পাতা উল্ে যাচ্ছেন। কারন আজ বিকেলেই তাকে ট্রেন ধরতে হবে তো, কিন্তু এই বৃষ্টির জ্বালায় সে উপায় আছে। এবারে বলি এই সুভাষবাবুটা কে! সুভাষবাবু অর্থাৎ সুভাষ মিত্র পেশায় একজন লেখক। সারাদিন পাগলের মতো লেখালেখি করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় তার কোনো লেখা আজ পর্যন্ত কোনো ভালো পত্রিকায় জায়গা করে নিতে পারল না। তিনি আবার ভূতে বিশ্বাস করেন না তাই ভূতের গল্প লিখতেও খুব একটা আগ্রহী নন। ভূতের গল্প শুনলে ওনার বুজরুকি আর মনগড়া গল্প ছাড়া কিছুই মনে হয় না। যাই হোক অবশেষে বৃষ্টিটা একটু ধরতেই তিনি রওনা দিলেন। তারপর রাজনগরে যখন পৌঁছলেন তখন দেখলেন বৃষ্টি একেবারে থেমে গিয়ে চারদিক চাঁদের আলোয় জ্যোৎস্নাস্নাত হয়ে যাচ্ছে।

বেশ খানিকটা হাঁটার পর তিনি একটা পুরোনো তেতলা বাড়িতে গিয়ে উঠলেন। এসব অবশ্য উনি আগে থেকেই ঠিক করে রেখেছিলেন এক বন্ধুকে বলে। শহর থেকে দূরে নির্জন স্থান। লেখালেখির জন্য বেশ ভাল। দেখেই পছন্দ হয়ে গেল সুভাষবাবুর। পুরোনো দিনের তেতলা বাড়ি, কিছু কিছু স্থান ভেঙে গেছে, বাড়ির ফাটলে লতানো গাছও জন্মেছে। বাড়ির ভেতরটা কিন্তু অন্যরকম বেশ সাজানো গোছানো এবং কয়েকজন লোকও রাখা আছে বাড়ির কাজকর্ম করার জন্য। সকলেই নিজের কাজে ব্যস্ত কেউ কারো সাথে কথা পর্যন্ত বলছে না। সুভাষবাবু নিজের মনে ভাবলেন আগে একটু বিশ্রাম নিয়ে নিই পরেই না হয় আলাপ পরিচয় করা যাবে এখন তো কয়েকদিন আছি এখানে।

সবেমাত্র হাত-মুখ ধুয়ে লিখতে শুরু করবেন, টেবিলে জলখাবার চলে এল। সুভাষবাবু খাতার দিকে তাকিয়ে অন্যমনস্কভাবে বললেন– "ঠিক আছে। তা আপনার নাম কি ? এখানে কোথায় থাকা হয় ?" প্রশ্ন করে পেছন ফিরে দেখলেন সে আর নেই। তারপরই বন্ধুর ফোন–

– "কিরে! সব ঠিকঠাক চলছে তো ?"

– "সব ঠিক আছে। কোনো অসুবিধে নেই"– বলে ফোনটা কেটে দিলেন সুভাষবাবু।

বেশ ভালোভাবেই কাটছে দিনগুলো। সময়মতো খাবার চলে আসছে আর যা কিছু দরকার মুখে বলার আগেই পেয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু একটা ব্যাপারে খুব খটকা লাগছে এরা কেউ নিজের পরিচয়ান কেন দিচ্ছে না। কয়েকদিন পরে সুভাষবাবু একপ্রকার রেগে গিয়েই বন্ধুকে ফোন করে বসলেন– "ব্যাপারটা কি বলত এরা কেউ কথা বলছে না কেন ?" আমার কিন্তু ব্যাপারটা সুবিধের বলে মনে হচ্ছে না।"

– "কেন ? ওরা কি তোর খাতিরযত্ন করছে না ?"

– "না। ব্যাপারটা ঠিক সেরকম না।" বলতে না বলতেই ফোনের ওপার থেকে এক ভয়ানক অট্টহাসির শব্দ শুনতে পেলেন সুভাষবাবু। তিনি এসবের কারণ জানতে চাইলে বন্ধু ফোনের ওপার থেকে বলতে শুরু করল– 'আমরা কেউই বর্তমানে জীবিত না। আর বাড়িতে যাদের দেখছিস ওরা আমার দাদুর আমলে এই বাড়িতেই কাজ করত। মৃত্যুর পরেও ওরা এখানেই থেকে গেছে।" এরপরে ওনার বন্ধুর সাথে ঠিক কি কথা হয়েছিল সেটা তিনি কাউকে বলেন না। তবে এর বেশকিছুদিন পরেই তিনি খ্যাতি অর্জন করলেন কলকাতার একজন বিখ্যাত প্যারানরমাল এক্সপার্ট হিসেবে। ইতিমধ্যেই তিনি দেশের প্রায় ৩০০ টির মতো ভুতুড়ে স্থান দর্শন করেছেন। আধিভৌতিক বিষয়ে লেখা বিভিন্ন প্রবন্ধও জার্নালে প্রকাশিত হয়। কলকাতায় প্যারানরমাল রিসার্চের জন্য একটি টিমও তিনি গঠন করেছেন। এখন অবশ্য তিনি বিশ্বাস করেন পৃথিবীতে এখন অনেক ঘটনাই ঘটে যেগুলোর ব্যাখ্যা বিজ্ঞানও দিতে পারে না।

বোধন

তনুশ্রী জানা, জীববিদ্যা অনার্স, ৪র্থ সেম.

মেয়েটির নাম ছিল অঙ্কিতা, অঙ্কিতা সাহা। বাবা-মায়ের একমাত্র সন্তান। অঙ্কিতা যখন দুই বছরের ছিল তখন তার বাবা মারা যান। মা একা হাতেই ওকে মানুষ করছেন। অঙ্কিতার মা একটা স্কুলে রান্না করে যত টাকা পান ওই দিয়েই সংসার চলছে। তবে একা হাতে আর কতদূর সামলাবেন। কিছুতেই আর পেরে উঠছেন না।

সব বাবা মা ই তো চান যে তাঁদের ছেলেমেয়েরাও পড়াশোনা করে একদিন অনেক বড়ো হবে, তাঁদের নাম উজ্জ্বল করবে। কিন্তু সবার স্বপ্ন তো আর পূরণ হয় না। অনেক ইচ্ছে থাকা সত্বেও মিতা দেবী কিছুতেই অঙ্কিতাকে স্কুলে ভর্তি করতে পারলেন না। আসলে স্কুলে রান্না করে যতটুকু টাকা পয়সা পেতেন, তাতেই ওনাদের নুন আনতে পান্তা ফুরানোর মতো অবস্থা। তাই অঙ্কিতাকে স্কুলে ভর্তি করার ইচ্ছেটা অকালেই চাপা পড়ে যায়।

অঙ্কিতা বাড়িতে মায়ের কাছে যতটুকু পারতো পড়াশোনা করতো। পড়ায় খুব ভালো মাথা ওর, সাথে হাতের লেখাটাও। বাচ্চা মেয়েটির হাতের লেখা যেকোনো মানুষকেই তাক লাগিয়ে দেওয়ার মতো।

পড়াশোনার পাশাপাশি অঙ্কিতার আরও একটি ভালো গুণ আছে, ছবি আঁকা। আশেপাশে যাকিছুই দেখতে পায় সেটাই সে তার ছবিতে ফুটিয়ে তোলে। এইটুকু একটা মেয়ের এমন অসাধারণ গুণের পরিচয়ে সত্যিই যে কেউই অবাক হয়ে যাবে।

মিতা দেবী রোজ স্কুলে রান্না করতে যাওয়ার সময় অঙ্কিতাকে সাথে করে নিয়ে যেতেন। এমনিতেই বাচ্চা মেয়ে, তার উপর যা দিনকাল পড়েছে। মিতা দেবীর বিশ্বাস নেই আজকালকার দিনের মানুষজনকে। যেখানে মায়ের বয়সী মানুষও বাদ যায় না ধর্ষণের শিকার হতে, সেখানে একটি বাচ্চা মেয়ে মানুষ কিভাবে রেহাই পাবে!

তাই মিতা দেবী রোজ অঙ্কিতাকে সাথে করে স্কুলে নিয়ে যান। সেদিনও নিয়ে গেছিলেন সাথে করে। মিতা দেবী ভেতরে রান্না করছিলেন আর অঙ্কিতা একটা চক নিয়ে নিজের মনে রান্নাঘরের দেওয়ালে মা দূর্গার ছবি এঁকে চলেছে আর বিড়বিড় করে বলছে . . . " মা তুমি তো সবার মা। সবার দুঃখ কষ্ট দূর করে দাও তাহলে আমাদের এত দুঃখ কেন ? আমরা কেন ঠিকমতো খেতে পাইনা। আমি কেন পড়াশোনা করতে পারলাম না, স্কুলে যেতে পারলাম না ? তুমি কি তাহলে শুধু ধনীদের মা, আমাদের মা নও ?"

ছোট্ট অঙ্কিতার এই কথাগুলো হয়তো মায়ের কানে পৌঁছেছিল তাই হয়তো স্কুলেরই একজন শিক্ষিকা ওদিক দিয়ে যাওয়ার সময় অঙ্কিতার কথাগুলো শুনতে পান। বাচ্চামেয়েটির কথাগুলো এমনই মর্মস্পর্শী ছিল যে ওই শিক্ষিকা নিজের চোখের জলকে আটকে রাখতে পারলেন না।

কাছে এসে অঙ্কিতাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন . . .

– "কে বলেছে মা শুধু ধনীদের হুম ? কে বলেছে তোমায় ?"

হঠাৎ করে ম্যাম এসে ওকে এইভাবে জড়িয়ে ধরায় অঙ্কিতা একটু হতচকিত হয়ে যায় কিন্তু পরক্ষণেই আবার সে বলে ওঠে . . .

– "কেউ বলেনি আমায়। কিন্তু মা যদি আমাদেরও হতেন তাহলে তো আমরা এতো গরীব থাকতাম না। ঠিক মতো খেতে পরতে পেতাম, আর আমিও সবার মতোই স্কুলে গিয়ে পড়াশোনা করতে পারতাম। কিন্তু এসব তো কিছুই হলোনা।"

– "তুমি পড়াশোনা করতে চাও ?"

– "হ্যাঁ খুব। আমার ইচ্ছে আমি পড়াশোনা করে একদিন অনেক বড়ো হবো আর আমার মায়ের সব কষ্ট দূর

করে দিবো।"

– "তাই ? আচ্ছা আমার সাথে চলো তাহলে।"

রোহিনী ম্যাডাম অঙ্কিতার মাকে কিছু বলে ওকে সাথে করে নিয়ে গেলেন হেডটিচারের অফিসে। ওখানে স্যারের সাথে কথা বলে অঙ্কিতাকে ক্লাস ফাইভে ভর্তি করে দেন।

অঙ্কিতা তো স্কুলে ভর্তি হতে পেরে খুব খুশি। নিঃসন্তান রোহিনী ম্যাডাম অঙ্কিতাকে ভালোবেসে ওর সব দায়িত্ব নিলেন। ওর দেখভালের দায়িত্ব, ওর পড়াশোনার দায়িত্ব সব সব।

মেয়েকে স্কুলে পাঠাতে পেরে মিতা দেবীরও মনের ইচ্ছা পূরণ হলো।

রোহিনী ম্যাডাম অঙ্কিতার জন্য টিউশনের ব্যাবস্থা করে দিয়েছেন, সাথে একটি আঁখার ক্লাসেও ভর্তি করে দিয়েছেন। রোজ নিয়ম করে অঙ্কিতা স্কুলেও যায়, টিউশনও পড়ে আর ছবিও আঁকে।

এইভাবে দেখতে দেখতে দুটো বছর কেটে যায়। অঙ্কিতা প্রত্যেকবার স্কুলে প্রথম হয়। সেবারেও অঙ্কিতা স্কুলে প্রথম হয়ে রেজাল্ট নিয়ে রোহিনী ম্যাডামের সাথে দেখা করে বাড়ি ফিরছিল। কিন্তু ভাগ্যের এমন পরিহাস যে রাস্তা পের হওয়ার সময় উল্টোদিক থেকে একটি গাড়ি প্রচণ্ড গতিতে এসে ওকে ধাক্কা দেয়। অঙ্কিতা ছিটকে গিয়ে পড়ে কিছুটা দূরে। ক্ষনিকের এই পরিস্থিতিতে সবাই হতবাক হয়ে গেছে। কিন্তু ততক্ষণে যা ক্ষতি হওয়ার তা হয়ে গেছে।

অঙ্কিতার মাথা আর ডান হাতটা দিয়ে স্রোতের ন্যায় রক্ত বয়ে চলেছে।

সঙ্গে সঙ্গে অ্যাম্বুলেন্স এসে যায়। অঙ্কিতাকে হসপিটালে নিয়ে যায় কয়েকজন মিলে। ততক্ষণে অবশ্য ওর বাড়িতে আর রোহিনী ম্যাডামের কাছে খবর চলে গেছে।

হসপিটালে তিনদিন জ্ঞান হারিয়ে শুয়ে ছিল অঙ্কিতা। তিনদিন পর জ্ঞান ফিরে পেয়ে চোখের সামনে রোহিনী ম্যাম আর নিজের মাকে দেখতে পেলো। ডান হাতটা তুলে ওনাদের ডাকতে যাবে কিন্তু ডান হাতটা তুলতে পারলো না। ডান সাইডটা পুরো অসাড় হয়ে আছে ওর। ওকে ডান হাত তুলতে দেখে ওর মা আর ম্যাডাম কাছে এলেন। ওনাদের পাশে আসতে দেখে অঙ্কিতা জিগ্যেস করে,

– "মা... ম্যাম, আমি ডান হাতটা তুলতে পারছি না কেন ? এত ভারী লাগছে কেন ?"

ওনারা কোনোমতে চোখের জল আটকে রেখে নিজেদের সামনে নেন। তারপর রোহিনী ম্যাম বলেন,

– "সোনা আসলে তোর ডান হাতটায় প্রচুর আঘাত লেগেছিল তাই ডক্টর ব্যাণ্ডেজ করে দিয়েছে। কিছুদিন পর সব ঠিক হয়ে যাবে"।

ম্যামের কথায় অঙ্কিতা ভরসা খুঁজে পায়। তাই হাসিমুখে ম্যামের বলা কথাটি সত্যি বলে বিশ্বাস করে নেয়।

কিন্তু আসল সত্যিটা তো অঙ্কিতা একদিন না একদিন জানবেই। ও তো একদিন এটা জানবেই যে ওর ডান হাতটা আর নেই, কেটে বাদ দিতে হয়েছে। যে হাত দিয়ে সে মুক্তোর মতো অক্ষর দিয়ে বাক্য তৈরি করতো। যে হাত দিয়ে সে মায়ের ত্রীনয়নী অঙ্কন করতো।

ডক্টররা সেদিন অনেক চেষ্টা করছিলেন অঙ্কিতার ডান হাতটা রক্ষা করার। কিন্তু পারেননি। হাতটা না কেটে ফেললে ক্যান্সার হয়ে যাওয়ার চান্স ৯৯%। তাই ওর প্রাণ রক্ষার্থে এই কাজটা ওনাদের করতে হলো।

আরও একসপ্তাহ হসপিটালে থাকার পর অঙ্কিতাকে ছুটি দিয়ে দেয়। অঙ্কিতা অবশ্য এখন সত্যিটা জানতে পেরে গেছে। আসল সত্যিটা জানতে পেরে তার স্বপ্ন চুরমার হয়ে যাওয়ায় সেদিন সে খুব কেঁদেছিল, মন থেকে সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছিল।

কিন্তু রোহিনী ম্যামের উৎসাহে অঙ্কিতা আবার নতুন ভাবে নতুন রূপে জেগে উঠেছে। সে মনস্থির করে নিয়েছে সামান্য এই শারীরিক ক্ষতিতে সে তার স্বপ্নগুলোকে এইভাবে মরে যেতে দিবে না। নতুন উদ্যম নিয়ে সে

সামনে এগিয়ে যাবে। তাইতো বাড়ি ফিরে এসে কিছুদিন বিশ্রাম নিয়ে, পুরোনো সব ভুলে গিয়ে নতুনভাবে বাম হাতে লেখা শুরু করেছে। যদিও বাম হাতে প্রথম প্রথম সে ততটা জোর পাচ্ছে না, তবুও তার বিশ্বাস যে একদিন না একদিন এই বাম হাতেই সে তার পৃথিবীটাকে নিজের কাছে খুঁজে পাবে। সবাই এক নামে চিনবে ওকে। এই কথাগুলো সে যতই ভাবলো ততই তার মনের জোর দ্বিগুণ বেড়ে গেল। এ যেন নতুন করে অঙ্কিতার বোধন হলো।

কয়েক মাসের মধ্যেই অঙ্কিতা ডান হাতের মতো লিখতে পেরে যায়। ছবিও আঁকে আগের মতোই। তবে আগের থেকে একটু ভালো আঁকতে পারে বোধহয়। কেননা বাঁ হাত দিয়ে আঁকা ছবিগুলোর মধ্যে কেমন যেন প্রাণ ফুটে উঠেছে ধীরে ধীরে... সব ছবিগুলোকেই পুরো জ্যান্ত বলে মনে হয়।

ধীরে ধীরে অঙ্কিতা পড়াশোনার পাশাপাশি ছবি আঁকা নিয়েও এগিয়ে যেতে থাকে। উচ্চমাধ্যমিক দেওয়ার পর রোহিনী ম্যাডাম ওকে একটা আর্ট কলেজে ভর্তি করে দেন। আর্ট কলেজে ভর্তি হওয়ার পর প্রথম প্রথম ওকে অনেকের থেকে শুনতে হয়েছে খোঁড়া গাঁইয়া মেয়ে এ আবার কি আঁকবে ... ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু অঙ্কিতা ওসবের দিকে কোনদিনই পাত্তা দেয়নি। বরাবরই ওদের নীচ মনোভাবকে এড়িয়ে গিয়ে নিজের কাজে মনোনিবেশ করেছে।

আর এইভাবেই অঙ্কিতা এখন ধীরে ধীরে নাম পেতে শুরু করেছে। তার আঁকা বহু ছবি এখন দেশবিদেশে অনেক দামে বিক্রি হয়। সবার মুখেই এখন এই শিল্পির নাম- অঙ্কিতা সাহা।

আগে যারা খোঁড়া গাঁইয়া মেয়ে বলে খিল্লি ওড়াতো এখন তারাই এসে যেচে চা-কফি অফার করে। অঙ্কিতার ওসব দেখে খুবই হাসি পায়, তবে মুখে প্রকাশ করে না কোনোদিনই।

সেদিনের সেই ছোট্টো অঙ্কিতা আজ একজন বিখ্যাত আর্টিস্ট। তার এই নাম যশের পিছনে একমাত্র রোহিনী ম্যাম রয়েছেন। সেদিন যদি রোহিনী ম্যাম ওকে নিজের মনে না করে স্কুলে ভর্তি না করাতেন তাহলে হয়তো এত আগুন ওইদিনই চাপা পড়ে থাকতে থাকতে কোনদিন হারিয়েই যেতো।

রোহিনী ম্যামের রিটায়ার্ড হয়ে যাওয়ার পর অঙ্কিতা তার দুই মা অর্থাৎ রোহিনী ম্যাম আর মিতা দেবীকে সাথে নিয়েই নিজের টাকায় কেনা নতুন ফ্ল্যাটে থাকছে। খুবই হাসিখুশিতে দিনগুলো কেটে যাচ্ছে এখন...।

ভাগ্যিস সেদিন অঙ্কিতার অ্যাক্সিডেন্টটা হয়েছিল, নইলে ওর বাম হাতে যে এতটা শক্তি, এতটা আগুন রয়েছে সেটা তো কেউই জানতে পারতো না। সত্যিই, ভগবান যা করেন বোধহয় ভালোর জন্যই করেন। নতুন ভাবে নতুন রূপে বোধন হওয়ায় অঙ্কিতা সাক্ষাৎ মা দূর্গার রূপে অবতীর্ণ করলো যেন।

সুন্দরবন ভ্রমণের অভিজ্ঞতা

পৌলমী প্রামাণিক, রসায়ন বিভাগ, দ্বিতীয় বর্ষ

"সুন্দরবন তুমি জুড়ে আছো বঙ্গের অঙ্গে,
একসাথে করছো বাস বাঘ হরিনের সঙ্গে।
বঙ্গদেশের অঙ্গ জুড়ে আছে সুন্দরবনে,
বনের মাঝে আছে মিশে বাঘ কুমিরের মনে।
ধন্য মোদের বঙ্গদেশ সুন্দরবনের মাঝে,
গাছ গাছালি আছে সবে নতুন নতুন সাজে।"

ভূমিকা ঃ বর্তমান যুগের ব্যস্ততা সর্বস্ব জীবনের ইঁদুর দৌড়ে আমাদের শরীর ও মন যখন রোজকার একই পরিবেশের ক্লান্তি এবং একঘেয়েমিতে ভরে ওঠে, তখন নিত্যদিনের সেই চেনা চারপাশ থেকে আমাদের মন একটুখানি মুক্তির আনন্দের জন্য ছটফট করে। সেই সময় মনকে কিছুদিনের জন্য বিশ্রাম দিতে এবং নিজের ক্লান্তি ও একঘেয়েমি দূর করে জীবনের পরবর্তী ব্যস্ততার জন্য তৈরি হতে প্রয়োজন ভ্রমণের।

ভ্রমণ আমাদের বর্তমান জীবনের এমন একটি অংশ যাকে অস্বীকার করে কোনোভাবেই ভালো থাকা যায় না। ভ্রমণ আমাদের ক্লান্তি ও গ্লানিতে ভরে ওঠা মনকে পুনরায় কোন এক জাদুকাঠির ছোঁয়ায় সতেজ করে তোলে। প্রথম সেমিস্টারের শেষের পরে শ্রদ্ধেয়া শুক্লা ম্যাডাম এবং মৃণালকান্তি স্যারের সাহচর্য এবং মাননীয় প্রিন্সিপাল ম্যাডাম জয়শ্রী লাহার সহযোগিতায় আমরা প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রীরা একটি নিরাপদ এবং সুন্দর ভ্রমণ সম্পন্ন করেছিলাম। এই সুন্দরবন একই সাথে নদী, মোহনা এবং জঙ্গলের এক অপূর্ব সমাহার। তাই কাছাকাছির মধ্যে প্রকৃতির কোলে কয়েকটি দিন কাটানোর জন্য সুন্দরবনের থেকে বেশি উপযুক্ত জায়গা আর কিইবা হতে পারে।

গন্তব্য ও যাত্রাপথ : আমাদের গন্তব্য সুন্দরবনের যাত্রা শুরু হয় গোপ কলেজ থেকে একটি ট্রাভেল বাসের তত্ত্বাবধানে, আমাদের বাসটি খড়্গপুর হাইওয়ে ধরে কলকাতার উপর দিয়ে প্রথমে পৌঁছয় ক্যানিংয়ে। আমাদের যাত্রা শুরু হয়েছিল ২৮.১২.২০১৯ রাত্রি ৯ টার সময় তাই আমরা সারা রাতের বাসে জার্নিতে খুবই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। তাই ক্যানিংয়ে কিছুক্ষণ বাস থামে এবং আমরা কেক খাওয়ার মধ্য দিয়ে আমাদের যাত্রা শুভ আরম্ভ করি। বাস ক্যানিং হয়ে পৌঁছে যায় সোনাখালি লঞ্চঘাট। সেখান থেকে দুটি লঞ্চে করে সুন্দরবনের বুকে একটু একটু করে আমাদের প্রবেশ শুরু। লঞ্চে ওঠার পর থেকেই মুহূর্তে মুহূর্তে চারপাশের দৃশ্য বদলে যেতে থাকে।

বেশ খানিকটা যাওয়ার পর দেখা যায় বিভিন্ন ধরনের নাম-না-জানা গাছ, পাখিদের মিষ্টি আওয়াজ নদীর দুপাশ থেকে কানে ভেসে আসে। লঞ্চ থেকে জলের দিকে চোখ পড়তেই দেখতে পেলাম বিখ্যাত গাঙ্গেয় ডলফিন বা চলতি ভাষায় যাকে বলা হয় শুশুক। আমরা লঞ্চের মধ্যেই ঐদিনের সমস্ত রকম খাওয়া-দাওয়া শেষ করে বিভিন্ন দর্শনীয় স্থানগুলো ঘুরে দেখে তারপর আমাদের গেস্ট হাউসের দিকে রওনা দিই। তারপর লঞ্চ থেকে যখন নামলাম তখন সূর্য প্রায় পশ্চিম গগনে ঢলে পড়ার মুখে। শীতের দিন বলে একটু শীত শীত করতে লাগলো।

উদ্ভিদজগতের অপরূপ বাহার : সুন্দরবন প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যে ভরপুর। আমাদের যে গাইড তার কাছ থেকেই জানতে পারলাম ভারত-বাংলাদেশ এই দুই দেশ জুড়ে বিস্তৃত সুন্দরবনে প্রায় ৩৫০ প্রজাতির উদ্ভিদ পাওয়া যায়। এর মধ্যে অধিকাংশই ম্যানগ্রোভ জাতীয় উদ্ভিদ। পৌঁছনোর পরেরদিন জঙ্গল সাফারিতে বেরিয়ে দেখতে পেলাম ঘন বনের ফাঁক দিয়ে সূর্যের আলো এসে পড়েছে মাটিতে।

বিভিন্ন নাম না জানা গাছ, পাখিদের আওয়াজ আর অদ্ভুত এক মায়াবী নিস্তব্ধতা সমগ্র প্রকৃতিকে যেন ঘিরে

রেখেছে। এরই মধ্যে শ্বাসমূল আর টেস মূল যুক্ত গাছগুলি পরিবেশকে আরো মায়াবী করে তুলেছে। পথে চলতে চলতে চোখে পড়ল বিভিন্ন ধরনের অত্যন্ত সুন্দর সুন্দর সব ফুল আর লতা গুল্ম। গাইডের থেকে শুনলাম এই জঙ্গলে বহু ধরনের ভেষজ উদ্ভিদ পাওয়া যায়। সবচেয়ে মনমুগ্ধকর গাছগুলির মধ্যে চোখে পড়ল বিখ্যাত সুন্দরী, গরান ও গেওয়া গাছ।

সুন্দরবনের প্রাণীকূল : সুন্দরবনের জঙ্গলের আরেকটি সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য এবং অবিচ্ছেদ্য অংশ হলো এখানকার প্রাণীকুল। সুন্দরবনের স্থলভাগ বিভিন্ন ধরনের প্রাণীদের স্বর্গরাজ্য। এদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলো রয়েল বেঙ্গল টাইগার। যদিও বর্তমানে বাঘের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যাওয়ার দরুন সহজে বাঘ চোখে পড়ে না।

জঙ্গল সাফারির প্রথম দিনে আমরাও বাঘ দেখতে পাইনি। তবে চোখে যা পড়েছিল তা কোনো অংশে কম নয়। দূর থেকে আমরা দেখেছিলাম সুন্দরবনের বিখ্যাত চিত্রা হরিণের পাল জল খেতে এসেছে নদীর ধারে; গাছের ডাল থেকে উড়ে যাচ্ছে অদ্ভুত সুন্দর রঙের পাখিরা।

আমাদের গাইডের সাহায্যে গাছের উপরে দেখতে পেলাম অদ্ভুত সুন্দর গিরগিটি। এছাড়া চোখে পড়ল গোসাপ, বন বিড়াল আরো কত কি। চলতে চলতে লোকমুখে জানতে পারলাম সুন্দরবনের জঙ্গলে অত্যন্ত সুদর্শন কিন্তু ভয়ংকর বিষাক্ত বহু সাপ রয়েছে। তাদের থেকে সাবধান থাকার জন্য ভ্রমণের সময় সঙ্গে গাইড এবং কার্বলিক অ্যাসিড রাখা বাধ্যতামূলক।

জলপথে ভ্রমণ : জঙ্গল সাফারির পরের দিন শুরু হলো সুন্দরবনের জলপথে আমাদের রোমাঞ্চকর ভ্রমণ। সুন্দরবনের জলপথ অন্যান্য জায়গা থেকে একেবারে অন্যরকম। কাছাকাছি মোহনা থাকার কারণে এখানকার জলভাগের প্রাণীবৈচিত্র্যও অন্যান্য জায়গা থেকে তুলনামূলকভাবে অনেক আলাদা।

বড় একটি লঞ্চে চেপে আমরা সেইদিন রওনা হলাম সুন্দরবনের আরো ভেতরে। সাথে সাথে নদীর দু'পাশের অরণ্যও ঘন হয়ে উঠতে থাকলো। লঞ্চ থেকে নদীর দিকে তাকাতে আবারও চোখে পড়লে শুশুক, তাছাড়া দেখা গেল বিভিন্ন ধরনের মাছ, বক, মাছরাঙ্গা পাখি ইত্যাদি। ইতিমধ্যে কয়েকবার কয়েকটি কচ্ছপও চোখে পড়ল।

বেশি কিছুদূর যাওয়ার পর নদীর একপাশে কাদার উপর দেখতে পেলাম দুটি কুমির রোদ পোহাচ্ছে। সেই দিন লঞ্চেই আমাদের দুপুরের খাওয়া দাওয়া এবং ঘুমের ব্যাবস্থা হয়েছিল। খাওয়া-দাওয়ার পর লঞ্চের ডেকে এসে জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে দেখতে পেলাম সূর্যস্নাত জঙ্গলের অদ্ভুত এক মায়াবী পরিবেশ। সমগ্র মন প্রসন্নতায় ভরে উঠলো। এই ভ্রমণের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য স্থান হল রবীন্দ্রনাথের গেস্ট হাউস পরিদর্শন, এছাড়াও বিভিন্ন ওয়াচ টাওয়ারের উপর থেকে আমরা রয়েল বেঙ্গল টাইগারের দেখা পাওয়ার আশায় বুক বেঁধেছিলাম কিন্তু আমরা আমাদের তিন দিনের জার্নিতে কোনো বাঘের দেখা পাইনি। আমরা পিরখালি, সন্ধ্যাখালি, সজনেখালি এরকম বেশ কিছু জায়গাতে ঘুরে বেড়ানোর পর সজনে খালিতে এসে একটি মিউজিয়াম এর বিভিন্ন সুন্দরবন সংক্রান্ত রক্ষিত জিনিসপত্রকে নিরীক্ষণ করলাম সেই সাথে একটি বড় জাহাজের ভাঙ্গা অংশ প্রত্যক্ষ করেছিলাম। এছাড়াও ছিল বনদেবীর মন্দির বিভিন্ন ধরনের রকমারি হনুমানের প্রজাতি এবং বিভিন্ন দেশের টুরিস্ট দেরকে সামনে থেকে দেখার সৌভাগ্য।

এছাড়া চোখে পড়ে বহু পাখিদের আনাগোনা, কানে আসে তাদের কলতান। নিচ থেকে একটি অস্থায়ী কাঠের সিঁড়ি দিয়ে ট্রি-হাউসে উঠতে হয়। বিকেলের পর গাছের উপর থেকে নিচে নামা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। যেই হোটেলে আমরা রাত্রি যাপন করেছিলাম তার পরিবেশ অত্যন্ত সুন্দর মনোরম সজ্জিত সেই হোটেলের একেবারে পাশেই ইউনেস্কো পরিচালিত সুন্দরবনের লোকসংস্কৃতির একটি চর্চা আমাদের দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল যার মধ্যে

সুন্দরবনের অধিবাসীদের দ্বারা পরিচালিত বিভিন্ন রকমের নাচ মাদল ধামসা সহযোগে এক মনোরম মনোহরণকারী অনুষ্ঠান আমাদের প্রত্যেককে বিমুগ্ধ করে। এছাড়াও সেই অনুষ্ঠানে বিভিন্ন রকমের সুন্দরবনের স্থানীয় আদিবাসীদের হাতে তৈরি থালা-বাটি কানের দুল বাঁশি কাঠের মূর্তি ঘর সাজানোর জিনিস ইত্যাদি বাহারি দ্রব্যাদি যেকোনো মানুষকে খুব সহজে আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়।

রসনা তৃপ্তি : বাঙালি একদিকে যেমন ভ্রমণপিপাসু, আরেকদিকে তেমন খাদ্যরসিকও বটে। তাই ভ্রমণে গিয়ে স্থানীয় রসনার স্বাদ না নিলে সেই ভ্রমণ অসম্পূর্ণ থেকে যায়। এই উদ্দেশ্যেই সুন্দরবনের বিভিন্ন খাবার চোখে দেখতে গিয়ে অভিভূত হয়ে পড়লাম।

এখানকার স্থানীয়দের মাটির হাঁড়িতে রান্না করা বন মোরগের মাংসের ঝোলের স্বাদ কোনদিন ভুলতে পারবোনা। তাছাড়া জলবিহারের দিন লঞ্চের রান্না হওয়া কাঁকড়ার ঝোলও ছিল অনবদ্য। এছাড়া এখানকার বন থেকে সংগ্রহ করা খাটি মধুর কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়। বাকি দিনগুলিতে বিভিন্ন ধরনের টাটকা সুস্বাদু মাছ আমাদের রসনা তৃপ্তি ঘটিয়েছিল। এছাড়া ট্রাভেল এজেন্সির সহযোগিতায় আমরা কিছু ঘন্টা অন্তর অন্তর চা-কফি সেবনের ব্যবস্থাটিকে খুব উপভোগ করেছিলাম।

উপসংহার : এইভাবে দুটি দিন সুন্দরবনে প্রকৃতির কোলে কাটিয়ে আমরা পুনরায় নিজেদের জীবনে ফিরে এলাম। ফিরে আসার জন্য আমরা বেছে নিয়েছিলাম জলপথকে। অর্থাৎ সুন্দরবন থেকে সরাসরি লঞ্চে করে পুনরায় শহরে ফিরে আসা। সেই অভিজ্ঞতাও অদ্ভুত সুন্দর ছিল। আসার দিন কিছুটা মন খারাপ থাকলেও সুন্দরবনের যে স্মৃতি আমরা জড়ো করেছিলাম সেই স্মৃতি রোমন্থন করে পরবর্তী দিনগুলো আবার আমরা সুন্দরবন এ পৌঁছে যাব এই আশা নিয়ে আমরা যথেষ্ট উল্লাসের সঙ্গে বাড়ি ফিরেছিলাম।

প্রকৃতির এই পরম আশ্রয়ে ওই কয়েকটি দিন আমার পরবর্তী সারা বছরের জন্য বাঁচার রসদ জুগিয়ে দিল। সেজন্যই হয়তো আজও রাতে শহরের ঘরের নরম বিছানায় ঘুমাতে গেলে সুন্দরবনে কাটানো রাতের কথা সেই জঙ্গলের কথা কিংবা ট্রি-হাউজের জানালা থেকে পূর্ণিমার রাতে বাইরের কুয়াশাচ্ছন্ন প্রকৃতি স্মৃতি মনে ভেসে আসে। এখানেই ভ্রমণের প্রকৃত সার্থকতা।

অভিশপ্ত পূর্ণিমা

সুদীপা সাউ

আমাদের প্রত্যেকেরই পূর্ণিমার রাত খুবই মনোরম লাগে আর লাগবে নাইবা কেন, পূর্ণিমার চাঁদ আর পূর্ণিমার রাত নিয়ে প্রকৃতি প্রেমিকেরা যে কত গল্প, কত কবিতা লিখেছেন তার কোনো ঠিক নেই। কিন্তু আজ আমি বলব আপনাদের এমন এক জায়গায় কথা যেখানে পূর্ণিমার রাত একটা ভয়ঙ্কর রাত নামে পরিচিত। চলুন গল্পটা তাহলে শুরু করা যাক।

আজ থেকে প্রায় ছয় বছর আগে ওই রহস্যময় গ্রামে একজন খুব সাহসী লোক কর্ম সূত্রে এসেছিলেন আর ঠাঁই নিয়েছিলেন ওই গ্রামের একজন গণ্যমান্য ব্যক্তির ঘরে আর লোকটির নাম ছিল বিজয় আর হ্যাঁ ওই মহামান্য ব্যক্তির নাম ছিল রজত মুখোপাধ্যায়। যেহেতু ওনার ঘরে বেশি কেউ থাকতেন না, শুধুমাত্র ওনাকে ছাড়া ওই ঘরে আর দুজন থাকতেন, ওনার স্ত্রী আর ওনার একমাত্র মেয়ে মৌলী, তাই তিনি বিজয়কে থাকতে অনুমতি দিয়েছিলেন। যেহেতু ওই গ্রাম সম্পর্কে বিজয় কিছুই জানত না তাই তার ওই গ্রামে আসার পরের দিনই রজত বাবু তাকে পুরো গ্রাম ঘুরিয়ে দেখান। গ্রাম ঘুরতে গিয়ে বিজয় একটা জিনিস লক্ষ্য করে যে ওই গ্রামে অবিবাহিত মেয়ে বেশি নেই আর যেই মাত্রই বিজয় রজতবাবু গ্রামের অবিবাহিত মেয়ের সংখ্যা কম হওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করে সেই মাত্রই রজতের মুখে চোখে অন্যরকমের ভাব ফুটে ওঠে আর প্রশ্নটা দ্বিতীয়বার করতে না বলেন। তা শুনে বিজয় এর কৌতুহল আরও বেড়ে ওঠে কিন্তু কিছু করার নেই কারণ বিজয় ওই গ্রামে নতুন ছিল। এরকম হতে হতে কিছুদিন কেটে যায়। তারপর এল অমাবস্যার পরের সেই দ্বাদশী যেদিন বিজয় জানতে পারল কেন অবিবাহিত মেয়ের সংখ্যা এই গ্রামে কম। আসলে ওইদিন বিজয় তার দরকারি কিছু জিনিস কিনতে বাজারে গেছিল আর জিনিসপত্র কিনতে কিনতে ও শুনতে পেয়েছিল ওই গ্রামের সম্বন্ধে কিছু অজানা কথা, কারণ কিছুজন মিলে ওখানে বসে বসে আলোচনা করছিল– "এবার কার পালা কে জানে"।

আর তারপর ও যা যা শুনেছিল তাতে সে তো তার নিজের কানকেই বিশ্বাস করাতে পারলো না। ভাবতে লাগল আজও কত মানুষ কুসংস্কারে আচ্ছন্ন।

(ওখানে তিনজন লোক ছিল আর তাদের কথোপকথন শুনছিল বিজয় আড়াল থেকে)

প্রথম জন : "ওই সবার মনে আছে তো আর দুদিন পরে সেই কালো রাত আবার কোনো অবিবাহিত মেয়ের জীবনের শেষ দিন।"

দ্বিতীয় জন : "সে আর বলতে।" (মাথায় হাত দিয়ে চরম বিপন্নতার সঙ্গে বলে উঠল)

তৃতীয় জন : "আচ্ছা আমাদের রজত বাবুর মেয়ে অবিবাহিত তাই না ?"

এই কথাবার্তা শেষ হতে না হতেই বিজয়ের মুখ থেকে ভুল করে বেরিয়ে গেল "হ্যাঁ"। সেইজন্য বিজয়ের উপস্থিতি সম্পর্কে যখন ওরা জানতে পেরে গেল তখন ও ভাবল এখন আর আড়াল থেকে না শুনে ওদের সামনাসামনি গিয়ে জিজ্ঞাসা করাটা ভালো।

তাই ও গেল আর জিজ্ঞাসা করল – "আপনারা কালো রাত বলতে কী বোঝাতে চাইছেন আর এর সঙ্গে অবিবাহিত মেয়েদের কী সম্পর্ক ?"

বিজয়ের প্রশ্নের উত্তরে ওদের মধ্যে থাকা প্রথম জন বলে উঠল,

– "না না, ও কিছু না। আপনি কি নিবেন বলুন।"

আর বাকি দুজন ওর কথাতে সায় দিয়ে বললো,

– "আপনি তো মনে হয় এই গ্রামে নতুন এসেছেন, তাই না ? আর আপনি তো মনে হয়, রজত বাবুর বাড়িতে থাকেন তাই না ?"

প্রথম বারে রজত বাবু বিজয়ের কথাকে এড়িয়ে গেল, আর এখন এরাও বলতে চাইল না দেখে বিজয়ের কৌতুহল অতীব মাত্রায় বেড়ে গেল। আর ওদের সঙ্গে কথা না বাড়িয়ে বিজয় বাড়ি ফিরে স্মৃতিচারণ করতে থাকে যে, সে ওই লোকেদের কাছ থেকে আড়ালে কী কী শুনেছিল। সেই কথাগুলো মনে করে একটা নয় দুটো কথা বুঝতে পেরেছিল। এক হল, দুদিন পর এই গ্রামে কিছু অঘটন ঘটতে চলেছে, যার জন্য ওই লোকেরা ওই রাতকে কালো রাত বলেছিল। এছাড়া আর একটা কথা বিজয় বুঝতে পেরেছিল যে ওই রাতের সঙ্গে অবিবাহিত মেয়েগুলোর কোনো না কোনো সম্পর্ক তো আছেই। এই ভেবে বিজয় অপেক্ষা করল ওই রাতের জন্য।

তারপর এল অবশেষে ওই কালো রাত। কিন্তু বিজয় সেই রাতে বাজারে গিয়েও ওই রাত আর অন্যদিনের রাতের মধ্যে কোনো পার্থক্য দেখতে পেল না। তাই সে আবার ঘরে ফিরে এসে রাতের খাবার সেরে শুয়ে পড়ল। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হল এই যে পরদিন সকালে চারিদিকে বেশ হইচই মেতে ছিল। আর ওই গ্রামের একটি ঘরে কান্নাকাটি করছিল সবাই। তা দেখে বিজয় ওদের জিজ্ঞাসা করতে একজন বলে উঠলেন,

– "আবারও কোনো অবিবাহিত মেয়ে শিকার হল ওই ডাইনীর কবলে পড়ে। কবে যে বন্ধ হবে সব। হে ঈশ্বর!" (এই বলে অশ্রুজলে ফেটে পড়লেন ওই বৃদ্ধ লোকটি)

তখন বিজয় লোকটিকে শান্ত করে লোকটির কাছ থেকে পুরো ব্যাপারটা জানতে চাইল। প্রথমে মুখ খুলতে না চাইলেও কিন্তু পরে যখন বিজয় ওনাকে কথা দিলো যে ও সবকিছু ঠিক করে দেবে, তখন সেই বৃদ্ধ মানুষ সব রহস্য খুলে বলেন এই বিশ্বাসের সঙ্গে যে এই যুবকটি মানে বিজয় ই পারবে এই ঘটনার পিছনে লুকিয়ে থাকা আসল রহস্য বের করতে। ওই বৃদ্ধ বলে উঠলেন (কেঁদে কেঁদে),

– "দু বছর আগে পর্যন্ত আমাদের গ্রামে সবাই বেশ আনন্দে থাকত। কিন্তু হঠাৎ আমাদের এই গ্রামের উপর কারোর কালো নজর পড়ে যায় আর গত দুবছর ধরে আমাদের গ্রামের অবিবাহিত যুবতিরা এক এক করে নিখোঁজ হতে থাকে, তাও আবার প্রতি পূর্ণিমাতে এই অঘটন ঘটতে থাকে। ওদের ঘরের যে জায়গা থেকে ওই ডাইনীরা উঠিয়ে নিয়ে যায় ওই জায়গায় দু-তিন ফোঁটা মত রক্তবিন্দু পড়ে থাকে আর ওই ডাইনীর উল্টো পায়ের চিহ্ন পড়ে থাকে আর ওই রাতেই কবরস্থান থেকে মাঝরাতে ভয়ঙ্কর শব্দ ভেসে আসতে থাকে। সেই শব্দটা এমনই যেন কেউ গানের সুর ধরেছে। সেই জন্যেই তো এখন কবরস্থানের দিকে যেতে খুব একটা বেশি কেউ সাহস পায়না।"

এই জায়গায় বিজয় তাঁকে থামিয়ে দিয়ে চরম বিস্ময়ের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করে,

– "এক মিনিট, কী বললেন, ডাইনী ?"

তখন উনি বললেন (মাথা নাড়তে নাড়তে),

– "হ্যাঁ, ঠিক তাই। ডাইনীরাই করছে এই কাজ। তার জন্যেই গত দুবছর ধরে যত মেয়েরা জন্ম নিচ্ছে ওদের সবাইকে ওদের মা বাবারা অন্য গ্রামের লোকেদের দত্তক দিয়ে দিচ্ছে সে যত কষ্টই হোক না কেন। এবার পালা হচ্ছে রজতবাবুর একমাত্র মেয়ে মৌলীর। ওই একমাত্র এখন বেঁচে থাকল অবিবাহিত মেয়েদের মধ্যে। আর এক মাস পরে আবার হবে এই অঘটনের পুনরাবৃত্তি।"

এই সমস্ত কথা শুনে বিজয় কিছুটা আন্দাজ করতে পারলো আর কিছু না বলেই ওখান থেকে চলে এলো। বাড়ি ফিরেই বিজয় সব কথাগুলো একসঙ্গে ভাবার চেষ্টা করলো আর নিজেকে প্রশ্ন করল যে, সত্যি কি আজও ডাইনী বলে কিছু আছে। তাছাড়া বিজয় খুব সাহসী মানুষ ছিল আর এইসবে ও বিশ্বাসও করতে পারছিল না তাই ও ভাবল এর পিছনে নিশ্চয়ই খুব বড় কোনো রহস্য লুকিয়ে রয়েছে। বিজয় ভাবল এখন অপেক্ষা হওয়ার কথা আছে মৌলীর। যাই হোক এই হতে হতে এক মাস কাটল আর এল সেই পূর্ণিমা। বিজয় সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে সে আর ঘুমাবে না।

দেখতে দেখতে রাত নেমে এল আর বিজয় খাওয়া দাওয়া সেরে ঘরের দরজা লাগিয়ে জানালা খোলা রেখে শুয়ে পড়ল হাতে একটা বই নিয়ে। কিন্তু ওর পরিকল্পনা ব্যর্থ হল কারণ ও বই পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়েছিল অজান্তে, যার জন্য ও কিছুই দেখতে পেলনা ওই রাতে কি হল। কিন্তু পরদিন সকালে ওর ঘুম ভাঙে অনেক লোকের কথাবার্তা শুনতে পেয়ে আর মৌলীর মা বাবার কান্নার শব্দ পেয়ে। আচমকা ঘুম ভেঙে যাওয়ায় ও প্রথমে কিছু বুঝতে না পারলেও কোথাও মৌলীকে না দেখতে পেয়ে ওর পুরো ব্যাপারটা মনে পড়ে যায়। ও তখনি ছুটে ছুটে মৌলীর রুমে উপস্থিত হল আর পড়ে থাকা দু-এক ফোঁটা রক্তের বিন্দু এবং ডাইনীর উল্টো পায়ের চিহ্ন যেন ওকে চোখে আঙুল দিয়ে বলছিল যে সে ব্যর্থ, মৌলীকে সে বাঁচাতে ব্যর্থ হয়েছে। তা দেখে বিজয় নিজেকে খুব দোষারোপ করতে থাকল আর ভেবে নিল যে এভাবে হাত পা গুটিয়ে বসে থাকলে কিছুই হবে না। সে নিজের কাছে শপথ নিল যে সে এই ডাইনীর রহস্য উদ্ঘাটন করবেই।

সবাই যখন জোর কান্নাকাটি করছে, তখন বিজয় নিজেকে একটা ঘরের ভিতর বন্দি করে সারাদিন ধরে ভাবতে থাকল সেই বৃদ্ধ লোকটির কথাগুলো যার কাছ থেকে ও প্রথম ডাইনীর সম্পর্কে শুনেছিল। রাতের দিকে ওর মনে পড়ল যে সেই বৃদ্ধ লোকটি বলেছিল যে, কবরস্থানে কেউ যায়না কারণ ওখান থেকে অনেক ভয়ানক আওয়াজ ভেসে আসত। এই কথাটা মনে পড়তেই ওর মনে খটকা লাগল। তাই ও ভাবল একবার হলেও কবরস্থান থেকে সবটা দেখে আসা উচিৎ। এই কথা ভাবতে ভাবতে যখন ওর অনেক রাত অবধি ঘুম আসছিল না তখন ও জানালার দিকে তাকায় পূর্ণিমার পরের দিনের চাঁদের মায়াজড়ানো উজ্জ্বলতাকে অনুভব করতে থাকে, কিন্তু সে ওমনি দেখতে পায় যেন কেউ একজন কালো কম্বল মুড়ি দিয়ে কবরস্থানের দিকে হেঁটে হেঁটে যাচ্ছে। তা দেখে সে ভাবতে থাকল, ওই বৃদ্ধ তো বলেছিল যে, কেউ কবরস্থানের দিকে এখন যায় না আর তা যদি সত্যি হয় তাহলে রাত ২.০০ টো নাগাদ ওই ব্যক্তি কেন যাচ্ছে ওইদিকে। তাইজন্য বিজয়ের সন্দেহ হল আর সে ওই লোকটার পিছু নিল আর লোকটির গন্তব্যস্থল দেখে বিজয় অবাক হয়ে গেছিল কারণ ওখানে শুধু ওই লোকটি ছিল না যার ও পিছু নিয়েছিল, তার সঙ্গে সঙ্গে ওখানে অনেকে উপস্থিত ছিল এবং তারা সবাই কালো কম্বলমুড়ি দিয়েছিল। তা দেখে বিজয় ওখানে একটা বড় পাথরের আড়ালে লুকিয়ে ছিল এবং পরে পরে সে যা দেখল আর শুনল তা ছিল সম্পূর্ণ অকল্পনীয়।

সবাই যখন তাদের কালো কম্বলগুলো খুলে দিল তাদের চেহারা দেখে বিজয় থতমত খেয়ে গেল কারণ ওই লোকেদের মধ্যে একজন ছিল রজত বাবু এবং আরও দুজন গ্রামের গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিল আর বাকিরা যারা ছিল ওদের বিজয় চেনে না। তাদের সম্পূর্ণ কথোপকথন বিজয় পাথরের আড়াল থেকে শুধু যে শুনল তা নয় বিজয় নিজের ফোনে voice recording ও করে নিল কারণ পুলিশকে প্রমাণ দেখাতে হবে।

রজত বাবু : "এই গ্রামে তো অবিবাহিত মেয়ে বলতে আর কেউ নেই।"

রজত বাবুর কথায় বাকি দুজন সায় দিয়ে বলল :

"হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক তাই।"

প্রথম অচেনা ব্যক্তি: "আপনাদের বিশ্বাস করতে আমাদের কোনো অসুবিধে নেই। যেখানে আপনারা টাকার বিনিময়ে নিজেদের মেয়েদের বিক্রি করে দিতে পারেন সেখানে আপনাকে বিশ্বাস না করলে আমরাই বোকা।"

দ্বিতীয় অচেনা ব্যক্তি: "আচ্ছা আপনার বাড়িতে থাকা ওই বিজয়ের কী খবর ?"

রজত বাবু : "ও আমার কাজে বাধা দিতে চেয়েছিল। কিন্তু আমি তো ওর গতকালের রাতের খাবারে ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে দিয়েছিলাম। নাহলে ও যা চালাক ছেলে ও আমাদের খুব সহজেই ধরে ফেলত।" (তখন বিজয় বুঝতে পারল কেন সে গতকাল রাত্রে ঘুমিয়ে পড়েছিল)

রজত বাবু : "ওই মেয়েরা বেঁচে আছে তো ?"

দুই অচেনা ব্যক্তি : "হ্যাঁ হ্যাঁ, ওরা একদম ঠিক আছে। দেখতে চান ?"

রজত বাবু : "বাইরে প্রাচার হওয়ার আগে আর একবার নিজের মেয়েটাকে দেখতে চাই। কারণ আজকে তাদের এই গ্রামে শেষ দিন। আর হ্যাঁ আগামীকাল কখন গাড়িতে নিয়ে যাওয়া হবে ওদের ?"

অচেনা ব্যক্তিগণ : "এইতো আগামীকাল রাত ১.০০ টার দিকে যখন সবাই নিজেদের ঘুমে মগ্ন থাকবে। দুবছর ধরে জমানো মেয়েদের কাল প্রাচার করা হবে।"

এই বলে ওরা যেখানে বসেছিল ওখানকার পাতাগুলোকে সরিয়ে ওখানে থাকা একটা গুপ্ত দরজা খুলে মাটির নীচের কোনো এক গুপ্ত জায়গায় ঢুকে গেল, যা দেখে বিজয় নিজের চোখকে বিশ্বাস করাতে পারছিল না। বিজয় ওদের পিছু নিল না ধরা পড়ার ভয়ে তাই বিজয় অপেক্ষা করছিল কখন তারা ওখান থেকে রওনা হয়। বিজয়ের ধারণা ঠিক ছিল। কিছুক্ষণ পরে ওরা ওই গুপ্ত জায়গা থেকে বেরিয়ে একে অপরের সঙ্গে হাত মিলিয়ে রজত বাবু আর বাকি দুজন গ্রামের গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ ওই দুই অচেনা ব্যক্তির কাছ থেকে একটা মোটা অঙ্কের টাকা নিয়ে ওই জায়গা থেকে রওনা হয়ে গেল। কবরস্থানে এখন বিজয় ছাড়া আর কেউ ছিল না।

তাই সবাই চলে যাওয়ার পর বিজয় ঠিক করল যে সে একবার সেই গুপ্ত জায়গাটায় যাবে। সেও সেই একইরকম ভাবে মাটির সঙ্গে মিশে থাকা দরজাটা খুলে সেই গুপ্ত জায়গাতে প্রবেশ করল যেটা মাটির নীচে খুঁড়ে খুঁড়ে তৈরী করা হয়েছে। সেখানে গিয়ে বিজয় গ্রাম থেকে নিখোঁজ হয়ে যাওয়া প্রতিটা মেয়েকে দেখতে পায়। ইতিমধ্যেই পিছন থেকে বিজয়কে জড়িয়ে ধরে মৌলী আর কান্নাভরা কণ্ঠস্বরে বলে ওঠে–

"বিজয় দা, তুমি আমাদের বাঁচাও। আমাদের কাল রাত ১.০০ টায় গাড়িতে করে বাইরের দেশে প্রাচার করে দেবে বলেছে। জানো আমার বাবা একজন মানুষ নয় ও একজন মানুষরূপী দস্যু যে টাকার জন্য সবকিছু করতে পারে। আমাদের বাঁচাও।"

বিজয়ের আর বুঝতে বাকি রইল না যে ডাইনী কথাটা ওই গ্রামেরই গণ্যমান্য ব্যক্তিদের দ্বারাই রটানো যা সম্পূর্ণ মিথ্যা আর সেই উল্টো পায়ের চিহ্ন, ওটা ওরা রঙ দিয়ে আঁকত যাতে ওই গ্রামের লোকেদের ডাইনী সম্পর্কে বিশ্বাস করানো যায়। সত্যি কথা বলতে বিজয়ের ও এক মিনিটের জন্য বিশ্বাস হয়ে গেছিল ওদের কথায়। মৌলী আর অন্যান্য মেয়েরা যখন সব কথাগুলো বলছিল তখন ও সব কথাগুলো বিজয় record করে নেয়। ভোর ৫ টার দিকে বিজয় ওই গুপ্ত ঘর থেকে সমস্ত মেয়েদের মুক্ত করার কথা দিয়ে বেরিয়ে সোজা গেল পুলিশের কাছে সমস্ত recording নিয়ে। বিজয় পুলিশের কাছে গিয়ে সব কথা খুলে বললো আর মেয়েদের বাঁচিয়ে নিতে বললো। যেহেতু বিজয়ের কাছে সব প্রমাণ তাই পুলিশ ওকে বিশ্বাস করল আর পরিকল্পনা বানাল কী রকম ওদের ধরা যেতে পারে হাতেনাতে। তারপর তারা সেই পরিকল্পনা মত কবরস্থানে ঠিক রাত ৯ টা নাগাদ পৌঁছাল এবং কেউ গাছের পিছনে লুকিয়ে, কেউ ঝোপের আড়ালে, কেউ আবার বড় পাথরের পিছনে লুকিয়ে গোটা কবরস্থানটা ঘিরে ফেললো। তারপর ওই লোকেরা সবাই এল এক এক করে কালো কম্বল মুড়ি দিয়ে আর তারপর তাদের গাড়ি এল যাতে করে মেয়েদের বাইরে প্রাচার করা হবে। তারপর তারা যখনই ওই গুপ্ত দরজা খুলে মেয়েদের আনতে গেল ঠিক তখনই পুরো সশস্ত্র পুলিশের দল ওদের পিছনে ওই গুপ্ত জায়গায় প্রবেশ করল।

তারপর সেই ব্যক্তিরা পুলিশের সামনে আত্মসমর্পণ করল আর সেই মেয়েরা রক্ষা পেল তাদের জীবন শেষ হওয়া থেকে। এখনও পর্যন্ত ওদের কেশ চলছে কোর্টে আর এখন সবাই বিজয়কে গ্রামের একজন বিশিষ্ট লোক বলে মনে করে। গ্রাম যা কিছু সমস্যা থাকে সবাই বিজয়ের কাছে এসে পৌঁছায় সঠিক সমাধানের আশায় আর এখন পূর্ণিমার চাঁদকে সবাই শুভ বলে মনে করে, অভিশপ্ত হিসেবে নয়।

তাই সবাই মনে রাখবেন যা আমরা সবসময় চোখে দেখতে পাই তা অনেকসময় সত্যি নাও হতে পারে।

কল্পশাখা

কৃষ্ণা বিষই, ইংরাজি অনার্স, প্রথম বর্ষ, ২য় সেমিস্টার

দেখ বাবা, মেয়েটা খুব ভালো, একবার ওর সাথে আলাপতো কর। বিয়েটা করে নে নিখিল, আমি আর পারছিনা, রোজ-রোজ সংসারের এত কাজ, তুই কি শুনছিস আদেও ?

মায়ের সমস্ত কথাই নিখিল গিলছিল শুধুমাত্র খাবার ছাড়া।

মাত্র তিন মাস যেতে না যেতেই মিলি নিজের রূপ ধারণ করেছে। প্রত্যেকদিন অশান্তি লেগেই আছে। সারাদিনের অফিসের ব্যস্ততার পর নিখিল এই রাত টুকুই সময় পায় নিজের জন্য। কিন্তু রোজ তাকে এই সময় শুনতে হয় সারাদিনের ঘটে যাওয়া শ্বাশুড়ি-বৌমার তিক্ততার কথা। এইসব শুনলে নিখিলের ভীষণ রাগ হয়। ছুটির দিন নিখিল বাড়ীতে থাকেনা, থাকলে সারাদিন দেখতে হয় শ্বাশুড়ি বৌমা-র ঝগড়া। রান্না করা নিয়ে, ঠাকুর ঘরে ঢোকা নিয়ে, বেশি খরচ করা নিয়ে দুজনের মধ্যে খিট খিট লেগেই আছে। দুদিন আগে ব্যাপারটা এমনই অসহনীয় হয়ে পড়েছিল যে, নিখিল রাগের মাথায় মিলিকে ঠাস করে একটা থাপ্পর মারে। ব্যাস! মিলি গেলো বাপের বাড়ি, হাতে এল ডিভোর্স পেপার। চোখ জলে ফরে গিয়েছিল নিখিলের। এই কারণের জন্যই তো সে বিয়ে করতে চাইতনা। সে জানত বিয়ে মানেই একঘেঁয়ে অশান্তি। তবু মায়ের জন্যই বিয়েটা করেছিল সে।

নিখিলের বাড়ি ফিরতে সেদিন অনেক রাত হল, অফিস থেকে ফেরার পথে বারে ঢুকেছিল সে। সেখানে বসে কত সাত পাঁচ ভেবেছে সে। সে কি আবার বিয়ে করবে ? অসম্ভব, আর না, যতই হোক এই ক-মাসে মিলিকে তো সে কম ভালোবাসেনি।

'নিখিল, নিখিল, এই নিখিল'।

সকালে মায়ের ডাকে ঘুম ভাঙল। হঠাৎ মনে পড়ল তাড়াতাড়ি তৈরি হতে হবে, মায়ের পছন্দ করা মেয়ে মিলির সাথে আজ তার প্রথম দেখা করার দিন।

দুই প্রজন্ম

শ্রেয়া চক্রবর্ত্তী, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ২য় সেমিস্টার

অম্বিকা আর নীলয়। সেই ছোট্টবেলা থেকে দুইজনে বেস্ট ফ্রেন্ড। এখন কলেজেও দুইজন একসাথে; একই ডিপার্টমেন্ট। ওদের এই বন্ধুত্বে ওদের বাড়ির লোকেরও সায় আছে। ওদের মধ্যে নেই কোনো ভুল বোঝাবুঝি; নেই কোনো গোপনীয়তা; দু'জন দু'জনকে সবকিছু মন খুলে শেয়ার করে। এই বন্ধুত্বই যে কখন ভালোবাসায় পরিণত হয়েছে তা ওরা নিজেরাই বুঝতে পারেনি। প্রত্যেকদিনই ওদের দেখা হয় কথা হয় কমবেশি। কলেজে বি.এ. ফাইনাল পরীক্ষা শেষ হতে না হতেই নীলয় একটি নাম করা বিদেশী কোম্পানীতে চাকরি নিয়ে বিদেশ চলে গেল। কলেজে বি.এ. ফাইনাল পরীক্ষা শেষ হতে না হতেই নীলয় একটি নাম করা বিদেশী কোম্পানীতে চাকরি নিয়ে বিদেশ চলে গেল। এদিকে অম্বিকা গ্র্যেজুয়েশনে ভালো নম্বর পেয়ে এম.এ. তে ভর্তি হলো। অম্বিকার মা-বাবাকে নিয়ে একটি ছোট্ট পরিবার। অম্বিকার বাবা এক সরকারী স্কুলের হেডমাস্টার আর মা সরকারী হসপিটালের নার্স। স্বচ্ছল অবস্থাই বলা চলে। অন্যদিকে, নীলয়ের বাবা এক সরকারী ব্যাঙ্ক কর্মী আর মা গৃহবধূ। বাড়িতে একটি ভাইও আছে নীলয়ের, এখনো সে স্কুলের গণ্ডি পেরোয়নি। নীলয়ের বাড়িতে আর এক সদস্য রয়েছে– একটি পোষ্য নাম তার চিনি।

নীলয় এখন এক নামকরা বিদেশী কোম্পানীর ম্যানেজার আর অম্বিকা সামান্য একজন সরকারী চাকুরীজীবী। নীলয় আর অম্বিকার মধ্যে এখন আকাশ-পাতাল তফাৎ। সে যাই হোক, এত ব্যস্ততার মাঝেও প্রায় প্রত্যেক দিনই ওদের কলে বা হোয়াটসঅ্যাপে কথা হয়; মাঝে মধ্যে ভিডিও কলেও কথা হয়।

এভাবেই ২ বছর কেটে গেল। হঠাৎ করেই এক দিন নীলয় অম্বিকার সাথে সব যোগাযোগ বন্ধ করে দিল। অম্বিকার ফোন রিসিভ করতো না, মেসেজ সিন পর্যন্ত করত না রিপ্লাই তো দূরের কথা। কিছুদিন পর অম্বিকা দেখলো নীলয় তাকে সবকিছু থেকে ব্লক করে দিয়েছে। অম্বিকা অনেক চেষ্টা করেছিল একটু যোগাযোগ করার... অন্তত কারণটা জানার জন্য যে, নীলয় এতটা বদলে গেল কেন!! কিন্তু তা আর পারল না।

দেখতে দেখতে গোটা ১ টা বছর পার হয়ে গেল। নীলয়ও আর কোনো যোগাযোগ করেনি আর অম্বিকাও নীলয়ের কথা ভাবেনি। একদিন অম্বিকা নিজের ঘরে বসে অফিসের কাজ করছিল, পাশের ঘরে অম্বিকার বাবা ওর মাকে ডেকে বললো– "আজ বিকেলে পাত্রপক্ষ দেখতে আসবে। বিকেলে অম্বিকাকে সাজিয়ে দিও।" অম্বিকা আড়াল থেকে সবই শুনেছিল কিন্তু মুখে টু শব্দটিও করেনি। বিকেলে পাত্রপক্ষ যথারীতি এসে হাজির। পাত্রের সাথে তার বাবা-মা আর ঠাকুমা এসেছে। এই ওদের পরিবার। অম্বিকাকে এক দেখাতেই পাত্রপক্ষের পছন্দ হয়ে গেল, এমনকি তারা বিয়ের কথাও পর্যন্ত পাকা করে গেলেন। এইদিকে তো অম্বিকার মা-বাবা বেজায় খুশি। কিন্তু অম্বিকা... সে কি খুশি ? সে খুশি না হলেও মা-বাবা যখন খুশি তখন আর মুখে কিছুই বললো না।

একমাত্র মেয়ে বলে কথা; তায় আবার স্বচ্ছল পরিবার– অম্বিকার বাবা একপ্রকার ধুমধাম করেই মেয়ের বিয়ে দিলেন। শ্বশুর বাড়ির সকলকে নিয়ে খুব সুখেই দিন কাটছে অম্বিকার।

২৫ টা বছর কেটে গেল। অম্বিকা-সমীরণের চুলে পাক ধরেছে। অন্যদিকে নীলয়-এলিনাও বুড়ো হতে চলেছে। ২৬ বছর আগেই নীলয় বিদেশে থাকাকালীন একটি বিদেশী মেয়েকেই বিয়ে করে। অপ্রত্যাশিতভাবে, অম্বিকা-সমীরণের একমাত্র ছেলে অস্মিত আর নীলয়-এলিনার একমাত্র মেয়ে লিসা এখন একই বেসরকারী অফিসে চাকরি করে। চাকরিসূত্রেই দুজনের আলাপ; সেখান থেকে বন্ধুত্ব; বন্ধুত্ব থেকে প্রেম। দুজনেই বাড়িতে তাদের এই সম্পর্কের কথা জানিয়েছে আর দুইজনের বাড়িতে মেনেও নিয়েছে। লিসার বাবার কথায় সামনের রবিবারই অস্মিতদের ওদের বাড়িতে আসতে বললো। রীতিমতো রবিবার দুপুরের আগেই অস্মিত বাবা-মাকে নিয়ে হাজির

লিসার বাড়িতে। সেখানেই অম্বিকা-নীলয়ের আবারও দেখা!! দুজনেই অপলক দৃষ্টিতে দুজনের দিকে চেয়ে আছে। আবার সেই ৩০ টা বছর আগে ফিরে গেল দুজনে। এইভাবে চেয়ে থাকতে দেখে লিসা-অস্মিত দুইজনেই বলে উঠলো– "তোমরা চেনো নাকি দুজন দুজনকে ?" . . .

অম্বিকা তো এই প্রশ্নের কোনো জবাবই দিল না আর নীলয় শুধু 'খুব কাছের মানুষ' বলেই নিজের রুমে গিয়ে দরজা লক করে দিল। সবাই তো একদম হতবাক! কারোর মুখে কোনো কথা নেই। অবশ্য কারোর আর ব্যাপারটা বুঝতে একটুও অসুবিধা হল না।

যন্ত্রহীন শূন্যতা

প্রতিভা মাজী, ইংরেজী বিভাগ, চতুর্থ সেমিস্টার

আস্তে আস্তে আমি, তুমি আমরা সবাই ব্যস্ততা, নিজের পেশায়, নিপুণ থেকে সুনিপুণ হওয়ার ভাগাদায় ডুবে গেছি, যে যার নিজের নতুন সাজানো জীবনে সুখী আছি কিংবা, সুখী থাকার দূর্দান্ত অভিনয় করে চলেছি... রোজকার ট্রাফিক-এ Red Signal পেয়ে মেজাজটা খিটখিটে হয়, তোমার দেওয়া হাতঘড়িটার দিকে বারবার তাকাতে তাকাতে প্রেজেন্টেশনটা সময়মাফিক দেওয়া যাবে কিনা, সে নিয়ে উদ্বিগ্নতা আর সিগন্যালে দাঁড়িয়ে গাড়ির কাঁচে টোকা মারা ফুল বিক্রি করা বাচ্চা মেয়েটার ওপর বিরক্তির এক জটপাকানো মিশেল মনকে অস্থির করে তোলে। অথচ, মনেই পড়ে না, ঘড়িটা তোমার দেওয়া। এখন ঘড়িটা রোজই পরি। যেদিন প্রথম চাকরী পাই, যখন ব্যস্ততা অতটাও গ্রাস করেনি আমায়, তখনই ঠিক করেছিলাম এটা। আগে আগে, যখন তুমি আর আমি ওই সিগন্যালের, ফুটপাথের বাচ্চাগুলোকে নিয়ে পড়াতাম, তখন যেদিন ঘড়িটা পরে যেতাম, তখন আলাদাই অনুভূতি হতো! ওদের নিয়ে, আমাদের একসাথে বাঁচার স্বপ্নোগুলোর কথাও সচরাচর মনে পড়ে না বাড়ির ইলেকট্রিক বিল, পেপারের টাকা, গ্যাস বুকিং, ব্যাঙ্কিং, বাজার-হাট করার ভীড়ে।

অনেক জন্ম তোমার মনে আমার, আমার মনে তোমার দেখা হয়নি... আবার কোনোদিন হঠাৎ তোমায় আমার, কিংবা আমায় তোমার মনে পড়লে, সংসার সামলে, বাচ্চার স্কুল ফীস, বাচ্চাকে সুইমিং, নাচ, গান, আবৃত্তি, আঁকার ক্লাসে নিয়ে যাওয়ার মাঝে, একে অপরকে কেন্দ্র করে আর কাব্য করা হবে না ... একে অপরের জন্য চিঠি লেখার ভাবনাকে আর পাত্তাই দেওয়া হবে না।

ভাবনাতে এতো ব্যস্ততা থাকবে, আমাদের একে অপরের আর একটিবার দেখা হওয়ার অপেক্ষায় জল দেওয়ার সময়টুকুও হবে না...

A Warm Winter night

Swagata Roy, Department of English, Semester-2

Some memories are nostalgic, some are saddistic, some are enjoyable and some are emberrassing. Such as enjoyable and embarrassing moment is memorable to me. It was an unpleasantly could winter's night; dark, mystifying, the moon was sheltered by the murky looming clouds. One late dark night I was sitting on a park-bench. I could feel the blizzard coming. I could smell the coldness of the late night. Suddenly, I saw a shadow in front of me. I saw him at my sixes and sevens eye. To see him I was on the spur of the moment. He sat beside me with a boquet of roses. He touched my hard to break the ice then I felt that a gentle air touched my body. After few times we started our conversation. Then he presented me the boquet of rose with open hands and told me 'Te quiero'. I saw a sourir in his lips. It made me then a pendulum. But the confusion was resolved when he touched my fingers and immediately chillness vanished and an unknown, inexperienced but undescribable good feeling was created. Then he came narer to me, my juvenile curiosity was ready to be completed. He gazed at me and a feeling of warmth mined with topsy-turvydom situation created perspiration amidst of biting colds. Alas! my dream has been broken.

প্রজন্ম

স্নেহলতা দাস, ৪র্থ সেম.

জন্ম হওয়ার পরেই তো শুরু
'প্রজন্ম' কথার উচ্চারণ
নিজের মুখে না হোক প্রথম
অন্যের মুখেতে উদ্বোধন
বাংলাতে 'প্রজন্ম' না শুনো তো
লোকেরা শোনাবে জেনারেশন
চিন্তাধারার রদ-বদল আজ
ঘটাবে আমাদেরই জেনারেশন
জাতি-ধর্ম-বর্ণ নিয়ে
ভেদাভেদ আজও অনেকখানি
সেই ভেদকে এড়িয়ে চলে
সম্মিলন ঘটাবো আমরা জানি।
মনীষীরা এই ভেদ নিয়ে করেছেন আলোচনা
একবিংশ শতাব্দীতে সেই নিয়ে এখনও সমালোচনা
মানবধর্ম, মানবজাতি সবার চেয়ে সেরা
এই ভাবনাকে গড়বে যারা
তারাই তো প্রজন্মের ধারা।

শিউলি ফুল

বিদিশা খুঁটিয়া, পদার্থবিদ্যা বিভাগ, ৬ষ্ঠ সেমিস্টার

তুমি রাতের ফোটা শিউলি গাছের ফুল–
ভোরের বেলা হবে তুমি শিশুর কানের দুল।
কমলা বোঁটা, পাপড়ি সাদা; দেখতে তুমি বড়ই ভালো
রাতের বেলা করে থাকো সারা জগৎ আলো।
ভোরের বাতাস গাছের থেকে ঝরিয়ে তোমায় দেয়,
ফুটফুটে সব ছেলেমেয়ে কুড়িয়ে তোমায় নেয়।
দুর্গামায়ের প্রিয় তুমি; প্রতি শরৎ কালে,
প্রস্ফুটিত হও যে তুমি দুটি নয়ন মেলে।
সুগন্ধ যে ভেসে বেড়ায় মৃদুল বাতাসেতে
আগমনী পুজোর গান বাজায় আকাশেতে।
উঠোনজুড়ে ছড়িয়ে থাকো সোনার হাসির মতো,
আনন্দে যে মনটা ভরে, খুশির আভা কত!
তাইতো তোমায় রোজসকালে জানাই আমন্ত্রণ,
এমনি করেই মনের মাঝে থেকো চিরন্তন।

নিমন্ত্রণ

মৌমিতা শেঠ, প্রাণীবিদ্যা বিভাগ, দ্বিতীয় সেমিস্টার

তাল খেজুরের ছায়ায় ঘেরা আমার পল্লী গ্রামে
দিক দিগন্তে আবির ছড়ায়ে সেখানে সন্ধ্যা নামে।
সময় পেলে এসো গো বন্ধু করিনু নিমন্ত্রণ
সবুজ ঘাসের গালিচায় শুয়ে ভরিবে তোমার মন।

আমাদের গ্রামে আজও তো জ্বলেনি উজল বিজলি বাতি
কেরোসিন তেলে লম্ফ জ্বালিয়ে কাটে আমাদের রাতি।
হেথায় বন্ধু পাবেনাকো তুমি ফ্রিজের ঠাণ্ডা দই,
প্রতি সকালে খেতে পাবে ভাই মাসূরী ধানের খই।

পাবেনা এখানে চপ-কাটলেট, বিরিয়ানি-মোগলাই,
খাঁটি দুধের ছানার মিষ্টি দিতে পারি যত চাই।
সরু-চালের সুবাসিত ভাত পেট ভরে তুমি খাবে,
টাটকা মাছের ঝোল আর ঝাল দু-বেলাই তুমি পাবে।

প্রতি সন্ধ্যায় দেখিবে তুমি তুলসী তলার পাশে,
গৃহের বধূরা শূচি বসনে প্রদীপ জ্বালাতে আসে।
প্রতি ঘরে ঘরে শঙ্খের বনি বাজিবে গোধুলি বেলা,
ঘরের শিশুরা ফিরে আসে ঘরে শেষ হয়ে গেলে খেলা।

হৃদয়ের খোঁজ পাওনি শহরে দেখে যাও গ্রামে এসে,
মানুষের মনে স্নেহ-মায়া-প্রীতি রয়েছে বাংলাদেশে।
এসোগো বন্ধু আমাদের গ্রামে করিনু নিমন্ত্রণ,
গ্রামের সকল ভাইবোনে মিলেদেব অভিনন্দন।।

প্রকৃতির প্রতীক্ষায়...

বৈশাখী দেববর্মন, পদার্থবিদ্যা, দ্বিতীয় বর্ষ

বসন্ত,
তুমি যে বারে ধীর পায়ে এসেছিলে,
লাগিয়েছিল তোমার রঙের আলতো আঁচ,
আনন্দ ধারায় আমায় করেছিলে
প্রাণবন্ত, চঞ্চল আর প্রেমময়–
সেদিন নৃত্যে, তালে, ছন্দে-ছন্দে, গানে
স্বাগত জানিয়েছিলেম তোমায়।
আমার আবির রঙে ফুটে উঠেছিল
পলাশ ফুলের মেদুর সুভাষ!
আমার শৃঙ্গার আর হাস্য রস সেদিন
হয়ে উঠেছিল বড়ই উতলা,
তুমিই আমায় রঙে, রসে, যৌবনে
উদ্দীপিত করেছিলে–
তাইতো আমি এক অতি সামান্যা নারী
নিজেকে প্রকাশ করেছি প্রকৃতি হিসেবে!
নিদ্রাভঙ্গ-জাগরিত আমি–
তাই আজ প্রেম পূজারিণী
বসন্ত,
তোমারি প্রতীক্ষা করে যাব আমি
বর্ষে বর্ষে।।

ভালোবাসি

শ্রেয়সী দাস
শিক্ষাবিজ্ঞান বিভাগ, প্রথম বর্ষ

হ্যাঁ ভালোবেসেছি
যখন তোমার চোখে
আমার জন্য অশ্রু দেখেছি
তখন ভালোবেসেছি
যখন লুকিয়ে রাখা যন্ত্রণা
না বলার সত্ত্বেও তুমি বুঝেছ
তখন ভালোবেসেছি

যখন আমার জন্য
তুমি প্রতিবাদ করেছ
তখন ভালোবেসেছি
যখন আমার কষ্টগুলো
হাসিতে রূপান্তর করেছ
তখন ভালোবেসেছি

যখন আমার প্রতিবাদে
তুমি ঢাল হয়ে দাঁড়িয়েছ
তখন ভালোবেসেছি

হ্যাঁ . . . আমিও ভালোবেসেছি
শত শত হাজার হাজার
লক্ষকোটিবার
শুধু তোমায় ভালোবেসেছি।

বিষাক্ত প্লাস্টিক

অনুরাধা শীট, ইতিহাস বিভাগ

সবার প্রিয় ক্যারিব্যাগ প্লাস্টিক পলিথিন
সংখ্যায় বেড়ে চলেছে দিনের পর দিন।
মাটিতে পচে না যে, না যে নষ্ট হয়
আগুনে পোড়ালে তাই,
পরিবেশ দূষিত হয়।
গঙ্গায় বয়ে যায় হাজার হাজার পলিথিন
শহরবাসী ভাবে কীনা এটাই তাদের ডাস্টবিন।
খাদ্যভ্রমে তিমি যদি গিলে ফেলে একবার
মৃত্যু যে তার অবধারিত,
তলিয়ে যাবে জলে।
কেউ কী জানে এর ব্যবহার বন্ধ হবে কবে ?
বিষাক্ত এই প্লাস্টিক ছড়াবেনা দূষণ
পরিবেশ থাকবে সুন্দর, যদি করো প্লাস্টিক বর্জন।

A Soulmate in a Stranger

Aritri Maiti, English Hons, 2nd Sem.

Before I was a loner
Always brooding in my own shelter;
Thought love would never stop by ever
As I couldn't find that special lover.
Then I met you one summer
For hours we sat and talked to each other ;
Like old friends we were,I remember
Funny, that I could find a Soulmate in a stranger.
I knew then I have found the perfect partner
Someone I could love and cherish forever ;
Now , my love has only grown deeper
And life with you has never been sweeter.

The Leader

Ritwika Acharjee,

Economics Department, 3rd Year

From dusk to dawn,
Are you tired of being a victim
And incensed up to the brim?
Are you tired of making
Allegations and frowns?
Or are you standing up
Making a difference
And flooring them down?

Now it's the time
To change your attitude,
Engender perception and mentality.
History and future will have you allude
So get up and preach dignity.

Idea never became reality?
Are visions still blurry?
So get up and teach
How you rose from your own misery
To all those who are doubtful
About their own capability.

You're the master of your own sea
Ain't no storm shaking you
Ain't nobody breaking you
Cuz you always say "I believe in me".

You're the leader built from vain
You're the justice of silence and pain.
You're the voice unheard of voiceless
You're the fire in darkness and to merciless.
You're the man of all those unrecognized
You're the savior of burnt and brutalized.

You don't need a tombstone to be remembered
Your grace and attitude makes them feel confident
And free like a bird.
Now they found a leader in you
Cuz you're the master of your own sea
You don't need navigation
Cuz you have always believed in 'You'.

নারী

রাফিকা খাতুন,

এডুকেশন অনার্স, ২য় সেমিস্টার

কলম তুলেই কী হবে ?
যখন প্রতিবাদই কেউ শোনেনা।
নারীর তীব্র চিৎকার যখন
সমাজ শুনতে পায়না।
নারীর ওপর এত লাঞ্ছনা, অত্যাচার
তবুও বন্ধ হয়না।
নারী মানেই ত্যাগ
নারী মানেই আবেগ।
নারী যখন অশিক্ষিত
তখন সে পীড়িত,
নারী যখন শিক্ষিত
তখন সে অত্যাচারিত।
নারী মানেই কাঁচের ঘরে বদ্ধ মৌমাছি,
যার প্রবল চিৎকার
কাঁচের শার্সিতেই আবদ্ধ।
নারী মানেই অক্লান্ত এক ছবি,
নারী মানেই সুতী শাড়িতে
এক দেবী!

অব্যক্ত

পলাশ ঘোড়ই, সহাধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ

মন যদি না আটকে গেল প্রেমে
বৃথাই তোমার মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা
ভুল তো আমার জানি আছে থাকবে
সঙ্গে তুমি থাকবে কিনা শেষটা।

তোমার জন্য বিকেল বেলা সাইকেল
তোমার জন্য রাস্তার ধারে ফুচকা

অল্প দেখাও ভীষণভাবে দামী
চোখের পাতায় তোমায় প্রতীক্ষা।

রাত্রি যখন আটকে গেছে চাঁদে

তোমার জন্য স্বপ্ন ধ্রুবতারায়,
প্যাঁচার মতো জেগে থাকি ফোনে
দিনের পেলা রোদ্দুরেতে হারাই।

শব্দ যখন পায় না খুঁজে ছন্দ

ছন্দ খুঁজি তোমার প্রতি শব্দে,
হিসেব কষে আদর করতে গিয়ে
আটকে গেছি জটিল শব্দ-জব্দে।

মন খারাপের মেঘলা বিকেলবেলা
তোমার সঙ্গে ইচ্ছে করে হাঁটতে।
আদিখ্যেতা করেও বলা হয় না

চাই যে আমি তোমার সাথে বাঁচতে।

মা

সুরঞ্জনা রায়, প্রাণীবিদ্যা বিভাগ, ২য় সেমি.

মাগো আমি আমার জীবন
দিলাম তোমায় সঁপে।
ধন্য হল আমার এ প্রাণ।
তোমার চরণে স্থান পেয়ে।।
তুমিই আমার মুখের হাসি,
তুমিই আমার সুখ।
তোমায় কখনো কষ্ট দেবো
ভাবলে কেঁদে ওঠে আমার বুক।।
দেখতে পারিনা মাগো,
তোমার চোখের জল।
তাইতো তোমার স্বপ্নপূরনে,
হয়েছি অটল।।
আমি শুধু দেখতে চাই
তোমার মুখের হাসি।
আমি তোমাকে মন, প্রাণ দিয়ে ভালোবাসি।।

জীবনের প্রতি

মনীষা মণ্ডল, বি.সি.এ.

হে আমার যাপনাযাপিত জীবন,
এভাবে আর কতদিন বাঁচা যায়।
কতদূর আর এভাবে টেনে নিয়ে যাবে।
চোখের সামনে মৃত্যু দেখছি শুধু,
যতবার বেঁচে ফিরছি দেখছি–
সবাই দুঃখকে লালন করায় পটু।
কেউ হাসছে, কেউ কাঁদছে, কেউ লুকোচ্ছে,
যন্ত্রণা কে ঘা মেরে হাসি বানানোর শিল্পী সবাই।
অথচ অবলীলায় ভালো আছি বলেই
মনের ভেতর অ্যাসিড বৃষ্টিতে পুড়ছে তাঁরা।

হে আমার বেদনা কাতর জীবন,
বলো এভাবে কতদিন চুপ করে থাকা যায়।
দপদপে প্রদীপের শিখার ন্যায় উন্মাদনা–
একটু একটু করে নিঃশেষ করছে গোপনে।
কেউ বুঝুক বা না বুঝুক–
তুমি তো টের পাও ঠিকই।
ঘর ঘর এই মর্মর দৃশ্য–
যেনো কেউ কোথাও ভালো নেই।
আমি শুধু সাদা পাতায় চোখের জল ধরে
তুলে রাখি, হাসি আর ভালো থাকি।

হে আমার স্পর্শ কাতর জীবন,
আমি বাঁচতে বাঁচতে হাঁপিয়ে উঠেছি।
কিছু না নেভা চিতার আগুনের ন্যায় দগদগে ক্ষত–
কেড়ে নিয়েছে ঘুম।
জানালা দিয়ে দেখা মেঘেদের সারী বিলোপ হওয়ার মতো
ক্রমশ নিজেকে লাগছে অস্তিত্বহীন।

হে আমার আবেগহীন কঠোর জীবন,
তুমি সব এক নিমেষে ভুলে যাও
মনে করো কোথাও কোনো দুঃখ নেই।
এ জীবনের সব কিছুই প্রাপ্তি।
আমি শুধু বাঁচতে চাই, বেঁচে উঠতে চাই।
আমি হাসতে হাসতে পার করে দিতে চাই–
এক মহাকাল অনায়াসে।

হে আমার বেপরোয়া জীবন,
পরিযায়ী হয়ে বাঁচতে দাও আমায়;
আমায় এক পাহাড়-নদী দাও জীবন।
তুমি যেমন বৃত্ত পরিক্রমার শেষেও স্বাধীন,
আমায় তেমন একটা জীবন দাও।
আমায় বাঁধন খোলা দাও জীবন।

"বন্দী অথচ সাজানো জীবন"

মৌমিতা রায়

'নারীরূপী' তকমাতে বন্দিত আজও মোরা।
তবুও মানে না যে মন, কোন বারণের সীমা।
লোকসমাজের কাছে, আজও অট্টহাসির দাসী মোরা।
তবুও সহ্যশক্তির অসীম সীমার অধিকারিনী মোরা।
"আমি চিত্রাঙ্গদা, আমি রাজেন্দ্রনন্দিনী,
নহি দেবী নহি সামান্যা নারী।"
'নারীরূপী শব্দে বন্দিত মোদের জীবন।
কিন্তু প্রতিটি মুহূর্তে সম্পর্কের আবরণের মায়াজালে,
আজও হাজার অবজ্ঞা–তাচ্ছিল্যবোধ কাঁধে নিয়ে সাজিয়ে তুলি নিজেকে,
বলি আমি যে একটা নারী।
ঐশ্বরিক শক্তির আশীর্বাদে এই বন্দি নারী,
কখনো মা দূর্গা, আবার কালীর রূপও নিতে পারে, তা সমাজের অবজ্ঞাত।
"চিত্ত যেথা ভয় শূণ্য উচ্চ সেথা শির . . . ।।"

অগ্নিজন্ম

মৌপর্ণা মুখার্জ্জী, অতিথি অধ্যাপিকা, প্রাণিবিদ্যা বিভাগ

আজ আগুন জুড়ে শুধুই বিশুদ্ধতা
আত্মার দেহান্তর ঘটছে।
একটা যুগের অবসান হলো।
যে আঙ্গুলগুলোর স্পর্শ পেয়ে এক আঙুল করে বেড়ে উঠতাম রোজ
আর ছুঁতে পারবো না কক্ষনো।
ধারালো ছুরি দিয়ে বুক কেটে ফালা ফালা হয়ে যায়,
প্রিয় মানুষটির সন্ধানে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়ায় রোজ।
শেষ বিকেলের ক্লান্ত ঘুমের বনিগুলি
একত্রিত হয়ে ঘুমের ভেতর বাঁশি বাজায়।
বেশ দেখতে পাই শ্রীকৃষ্ণকীর্তন বাজে, মহাপ্রভুর ভোগ নিবেদন হয়,
ওই তো আমার পরিচিত কণ্ঠস্বর আবার বেজে ওঠে।
অদৃশ্য হাতগুলির আশীর্বাদের ছোঁওয়ায় স্নিগ্ধ হয় আমার মস্তিষ্ক।
সেই মৃদু কণ্ঠ এসে বলে যায় "আমি ভালো আছি"।

শিক্ষাগুরু

এ. সিং

শিক্ষা নামক জ্ঞানদাতা তোমরা মোদের পিতা
তোমাদের আশ্বাসে মোরা তুলতে পেরেছি মাথা,
মোদের পিতার মোদের মাতার ছিলো নাকো কোনো স্বপ্ন
বড়ো হয়ে ছেলেমেয়েরা হবে সবার চোখের রত্ন।
ছোট্টোবেলায় তোমরা মোদের আশ্বাস জাগিয়ে ছিলে
নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারবে একটু পড়াশুনা করলে।
ছোট্টোবেলায় পড়ার সময় ভাবতাম বসে বসে
ফাঁকি দেবার প্লেন করবো অঙ্ক কষে কষে।
সঠিক পথে দাঁড় করিয়ে তোমরা তো সব চলে গেলে
দাঁড়িয়ে আছি সামনে যাবো তোমাদের আশির্বাদ পেলে।
সারাদিনরাত একই রকম ভগবানকেই বলি
আমি যেনো সারাটাজীবন সঠিক পথেই চলি।
যেতে যেতে হাজারো বিপদ সামনে ঘনিয়ে আসে
বিপদ কাটিয়ে সামনে যাওয়ার স্বপ্ন দুচোখে এসে।
চোখ কান সব বন্দ করে সামনে এগিয়ে চলি
চোখ খুলতেই দেখতে পেলাম লক্ষে যাওয়ার গলি।
আনন্দেতে দুচোখ বেয়ে জল গড়িয়ে আসে
তোমাদের মুখরাশি শুধুই যে চোখে ভাসে।
বুঝতে পেরেছি আমি...
শিক্ষা নামক জ্ঞান দাতা তোমরা মোদের পিতা
তোমাদের আশ্বাসে মোরা তুলতে পেরেছি মাথা।।

নারীসমাজ

দীপিকা সাউ

নারী, সে কে ?
সমাজ-প্রকৃতির একটা অংশ।
কিন্তু সেই নারীকেই
সমাজ দেয় না কোনো সম্মান।
প্রতিদিন, প্রতিসেকেণ্ড, প্রতিমুহূর্ত
সমাজের কাছে হতে হয় তাকে লাঞ্ছিত,
হতে হয় ঘাত-প্রতিঘাতের স্বীকার।
কারণ, সে এক নারী।
সংসারে কন্যা সন্তান জন্ম হলে
তা নিয়ে কোলাহল শুরু হয়ে যায়।
সমাজে চায় না কেউ কন্যা সন্তান
কিন্তু সংসারে ভালো বউ চায়।
নারীকে পড়াশোনা করতে দেওয়া হয় না
সমাজ বলে, নারী পড়াশোনা করে কী করবে ?
থাকবে তো সংসারের ছোট্ট একটা কোনে।
নির্দিষ্ট বয়স হতে না হতেই
বিয়ের পিড়িতে বসিয়ে দেওয়া হয়।
প্রতিটামুহূর্ত পরীক্ষা দিয়ে যেতে হয় নারীকে
সমাজ-সংসারে টিকে থাকার জন্য।
তাকে প্রাণ খুলে হাসতে হলেও ভাবতে হয়
কথা বলতে গেলেও ভাবতে হয়
তার নিজের সখ-আহ্লাদ থাকতে নেই।
নিজের স্বাধীনতা বলতেও কিছুই নেই
কারণ, সে এক নারী।
সমাজ বলে, এটাই নারীর নিয়তি।

দুদিন এই মুহূর্ত

প্রিয়াঙ্কা ঘড়া, জীববিদ্যা বিভাগ, ৪র্থ সেমিস্টার

ভোরবেলার শিশিরটাই জানে রাতটা কতটা দুঃস্বপ্নে ঢেকেছিল
বোধ হয় মাস্ক পরার দিন আর হাতে গোনা,
ঝাপসা চোখের ফোনটা আরো একবার নড়ছিল।
কানের পাশ থেকে সেই অভিশপ্ত বাতাসটা,
খুব দ্রুত গতিতেই বয়ে গেল।
মাস্ক পরাও হলো।।
কথায় আছে– "নাচতে না জানলে উঠোন বাঁকা।"
কিন্তু উঠোন তো ধুলোয় গড়াগড়ি খাচ্ছে।
বাগানের ঘাসগুলোতে মরচে ধরেছে,
অনেকদিন তিনটে কাঠি-পোতা হয়নি যে,
এখন শিউলি ফুলের গন্ধটাও যেন কেমন একটা
জীবাণুর আক্রমনে গাছগুলো কেমন মনমরা।
তবু বিশ্বাস হারানো দিনগুলো আবার ফিরে আসুক
নতুন কিছু জীবনের শিক্ষা নিয়ে।

মায়াবী প্রকৃতির বিপর্যয়

ঝুমা মান্না

পক্ষী সহ বৃক্ষরাজি,
মন নেই তাদের কর্মে আজি।
গতকালের স্নিগ্ধ হাওয়ার বাতাবরণ–
আজি কেবল প্রকৃতির বিবর্তন।
ছিল আনন্দ-মিলনের বনি,
আজ অকালমৃত্যুর কলরব শুনি।

কালের কুয়াশায় ঢাকা শীতের শীতল দিন
আজ সব কোথায় ? সকলই হয়েছে ক্ষীণ!
আকাশের সেই রং, ছিল কোমল নীল
এখন তার সহিত ধোঁয়ার হয়েছে মিল
ওই নদীর তীক্ষ্ণ শীতল ঢেউ,
আজ আর বিশুদ্ধ রাখেনি কেউ।

প্রকৃতিকে ব্যবহারের নামে যে অবক্ষয়,
তাই বোধ হয় ঘটছে বারংবার বিপর্যয়।
মায়াবী প্রকৃতির মায়াবী খেলায়;
মেতেছে মানব, লুটিয়েছে ধূলায়।
হারিয়েছে যেই সকলের বিবেকবোধ,
আসছে সেই মহামারীর আকারে ভিন্ন রোগ।।

মেদিনীপুর থেকে বলছি

বৈশাখী দেববর্মন

আমি হেঁটে চলেছি মেদিনীপুরের পথে-এই শহরের মর্মকথা জানাবো তোমায় শহরের এক অবিচ্ছিন্ন প্রান্ত থেকে।

'মেদিনীপুর' নিয়ে বলতে গেলে আমাদের ফিরে যেতে হবে ১৩ শতকের গোড়ার দিকে, যে সময়ে রচিত হয়েছিল 'মেদিনীকোষ'। এই 'মেদিনীকোষ' -এ উল্লেখ রয়েছে 'মেদিনীকার' নামক জনৈক রাজার। 'মেদিনীকোষ' অনুসারে রাজা মেদিনীকার হলেন মেদিনীপুর শহরের প্রতিষ্ঠাতা। যদিও ৮০০ বছর পূর্বের মহাভারতের কাহিনী অনুযায়ী বিরাট রাজার সাম্রাজ্যের অংশ ছিল মেদিনীপুর। একাধিক বিষয় বিশ্লেষণে জানা যায় মৌলানা মুস্তাফি মাদানী মেদিনীপুর প্রতিষ্ঠা করেন আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে এবং এই স্থানের নাম দেন মাদানীপুর। একদা মেদিনীপুর ছিল উড়িষ্যার অন্তর্ভুক্ত কিন্তু এটি জেলার সদরদপ্তর হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে ২২ শে সেপ্ টেম্বর, ১৭৮৩ সালে। উড়িয়া স্থাপত্য স্বরূপ জগন্নাথ মন্দিরে আংশিক চারচালার সাথে আংশিক উড়িষ্যার কারুর বিশেষ মেলবন্ধন পরিলক্ষিত হয়।

অবিভক্ত মেদিনীপুর স্বাধীনতার প্রাক্কালে সাঁওতাল বিদ্রোহ, কোল-ভিল-মুণ্ডা-চুয়াড় বিদ্রোহেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অর্জন করে। আজও মেদিনীপুরের শান্ত-প্রখর বাতাসে স্বাধীনতার একদল উন্মত্ত যৌবনের নিশ্বাস-প্রশ্বাস বয়ে চলে, যারা মেতে উঠেছিল জীবন-মরণের খেলায়, লক্ষ্য ছিল পরাধীনতার লোহার বেড়ি থেকে দেশ মায়ের মুক্তি সাধন। স্বাধীনতার রোমহর্ষক ইতিহাসে মেদিনীপুরের নাম লেখা স্বর্ণাক্ষরে। 'মেদিনীপুর জেলা স্কুল'–যেটির পরবর্তী নাম 'মেদিনীপুর কলিজিয়েট স্কুল'- সেটি ছিল তৎ কালীন স্বাধীনতা সংগ্রামী গড়ার আখড়া। শিক্ষক হেমচন্দ্র কানুনগো ছিলেন যুব স্বাধীনতা সংগ্রামীদের অনুপ্রেরণা। অগ্নিশিশু ক্ষুদিরামের বেড়ে উঠা এই মেদিনীপুরের হবিবপুরে-ফাঁসির রায় জজকোর্টে। ফাঁসির মঞ্চে প্রাণ দেন প্রদ্যোৎ কুমার ভট্টাচার্য, মৃগেন দত্ত, ব্রজকিশোর চক্রবর্তী, অনাথ বন্ধু পাঁজা প্রমুখ, বিমল দাশগুপ্ত, যাঁকে দীর্ঘদিন কারারুদ্ধ থাকতে হয়, আরও বহু তাজা প্রাণের রক্তে মেদিনীপুরের মাটি পবিত্র হয়েছে। নাড়াজোল তথা মেদিনীপুরের রাজা নরেন্দ্রলাল খান এবং পরবর্তীকালে তাঁর পুত্র রাজা দেবেন্দ্রলাল খান সরাসরি ভাবেই স্বাধীনতা আন্দোলন, স্বাধীনতা সংগ্রামীদের গুপ্ত সমিতি গঠন, নারী স্বাধীনতা আন্দোলনের সাথে যুক্ত ছিলেন। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু ও তার দাদা শরৎ চন্দ্র বসু ছিলেন রাজা দেবেন্দ্রলালের পরম বন্ধু। একদা নেতাজি এক রাত্রি কাটিয়েছেন রাজার বাড়িতে (বর্তমানের গোপ প্যালেসে)। সরকার কর্তৃক 'হেরিটেজ' হিসেবে আখ্যায়িত এই গোপ প্যালেস।

করোনা

সুপর্ণা দাস

করোনা তুমি যুগে যুগে এসে
রেখে যাও এই ভয়,
তোমাকেই আজ ভয় পেয়েছে
সারা বিশ্বময়।।
আজ তোমারই ভয়ে নেতারা বাচ্চারা
গর্তে লুকিয়ে রয়,
গরীবের রক্ত যারা চেটে খায়
যেন তাদের মৃত্যু হয়।।
আজকে সবাই ধর্ম ভুলে বলেছে
বাঁচাও আমার প্রাণ,
মানুষেরা আজ হিংসা ভুলে বুঝেছে
সবাই আমরা সমান।।
তোমার কৃপায় বন্ধ হয়েছে
সীমান্তের হানাহানি।
পৃথিবীর আজ শান্তময়
বাতাসে কমেছে বোম-বারুদের গন্ধ।।
বিশ্বটা আজ পুতুলের মতো চার দেওয়ালে বন্ধ,
রক্ষা করো হে ভগবান
মানুষ আজকে জব্দ।।

Lock Down

Suparna Das

An alarmed to her mother earth
Thy people at midst of confusion,
Fearing of one's own death,
Four corners of the World lock down.

Everyone quake in one's boots,
Absolute insecurity feelings,
Patients in hospital at death's door,
Front line workers dice with death.

Self volunteers call the tune,
In toot one's own horn,
Ignorance of social distancing,
In a hurry to meet ones own needs.

All walks of life to the lock down,
Mandires shutdown, is our faith
Shutdown?
Are we a lukewarm Hinduisam now?
This World suffers into a Jam.

কল্পিত

প্রিয়াঙ্কা ঘড়া, প্রাণীবিদ্যা বিভাগ, ৪র্থ সেম.

মার্চের শেষে ডাক দিল ক্ষণে,
করোনা এসেছে মাস্ক পরে নে।
মনে তখন আবেগের মেলা,
কিন্তু বেরোতে পারবনা দুইবেলা।
খেলাধূলোর বিকেলটা তখন কুয়াশায় ঢেকে গিয়েছে
অভিশপ্ত সময়টা বোধহয় বাসা বেধেছে।
কিন্তু কথায় আছে "আমরা করব জয়।"
কিন্তু ঢাল তরোয়াল তো ডাক্তারদের হাতে,
"তাহলে আমরা কী প্রাচীর হয়ে দাঁড়াতে পারি না" ?
"নিজেদের প্রয়োজনীয় ভ্যাকসিন টা নিতে পারি না" ?
প্রশ্ন একটাই .....
"আবার কি আমরা পুরোনো আনন্দটা ফিরে পেতে পারি ?"
উত্তরে হ্যাঁ ....
অবশ্যই পারি।

অপেক্ষা

মঞ্জুরী রাউত, ইংরেজি বিভাগ, তৃতীয় বর্ষ

দিন যায়, মাস যায়, বছর ও যায় চলে,
পূর্বের অভ্যাস ও প্রায় গেছি ভুলে।
ঘরবন্দি সারাদিন মন নেই ভালো,
অপেক্ষারত সবাই খোঁজে শুধু শান্তির আলো।
স্বাভাবিক জীবনে ফেরার জন্য মনে অনেক আশা,
মুঠোবন্দি ফোনের জীবন শুধু একঘেয়েমি আর নিরাশা।
খাঁচাবন্দি পাখি যেমন থাকে মুক্তির আশায়,
হৃদয়ও আজ তেমন নতুন ভোরের অপেক্ষায়।
একদিন ঝড় থেমে যাবে, এই অপেক্ষায় থাকব,
পৃথিবী আবার শান্ত হবে, সবাই সুখে ভাসব।

শিক্ষার আলোকে শিক্ষক

সাক্ষি মিদ্যা, ইতিহাস বিভাগ, ২য় সেমি.

শিক্ষক হলেন আলোর পথের
সত্য নির্ভীক যাত্রী
অনুসরণে পথ চলে
সকল ছাত্র-ছাত্রী।

শিক্ষক জ্বালান মনে প্রদাপ
প্রতিভা বিকাশে
শিক্ষক ছড়ান জ্ঞানের আলোক
অশিক্ষার আকাশে।

মায়ের কাছে শিশুর শিক্ষা
জন্ম থেকেই শুরু
মায়ের পরেই শিক্ষক হলেন
জ্ঞানের আর একগুরু।

যেসব শিক্ষক আদর্শতায়
শিক্ষা দিতে রত
তাদের দেখলে হয় যে আমার
শ্রদ্ধায় মাথা নত।

শিক্ষক হলেন শ্রদ্ধার পাত্র
শিক্ষার অতি সুজন
শিক্ষকরাই করেন একেকজন
উকিল ডাক্তার সৃজন।

শিক্ষক সকল ন্যস্ত থাকেন
জ্ঞান ছড়ানোর চাষে
সম্মান করলে শিক্ষকদের
সাফল্যতা আসে।।

নেতাজী

তিস্তা মিশ্র, ২য় সেমি.

হে নেতাজী, হে নেতাজী
তুমি আর রইলে না, এত স্বাধীনতা সইলে না,
বাড়ছি যতই, ভাবছি ততই,
ভাবনা যাচ্ছে গভীরে।
কত বিপ্লবী, কত যোদ্ধা,
সেলাম করে আজও তোমারে।
বিপ্লবী আর বিমান যাত্রা,
ওসব তোমার জলঘাট
যুদ্ধ আর বাহীনি গঠন
ওটাও তোমার নয় বিরাট,
ভারতের প্রতি বুকভরা ভালোবাসা দিলে করে উজাড়,
কিন্তু না,
নাটকীয় নেতারা মনে রাখল না যে সে প্রতিদান তোমার।
কত কারা বাস,
কত স্বার্থত্যাগ করলে তুমি–
বারংবার করেছো চুম্বন,
এ ভারতের মাতৃভূমি।
তুমি গিয়েছিলে স্বাধীনতা আনতে ছিনিয়ে
বাকিরা করতো ভিক্ষা,
স্বাধীনতা মোটেও ভিক্ষার অংশটুকুও না
এই ছিল তোমার শিক্ষা।
তোমার দেশে তুমিই নায়ক
তোমারই সৃষ্টি বিপ্লব
তোমার ও কোনো স্বার্থ ছিল না
শুধুই হলো নির্লোভ
তুমিই নেতাজী অনায়াসে করেছো পদযাত্রা
ভেঙেছো ব্রিটিশদের দাঁতের গোড়া,
বাকিরা আর কিছু নয়,
পাতিপুকুরে লোক দেখানো চোড়া।
রক্তের পরিবর্তে স্বাধীনতা দেবার বাণীতে চমকে ওঠে ব্রিটিশ,
ভয়ে কেঁপে উঠেছিল তারা।
তোমার অবর্তমানে আজ সবই হতো
পিতৃহারা, স্বাধীনতা হারা এবং বীরত্ব হারা।
সর্বশেষে রইলে না,
কোথায় গেলে বললে না
স্বাধীনতা দেখলে না
স্বাধীনতা দেখলো যারা,
তোমার বিরোধীতা করলো যারা।
হে নেতাজি, হে নেতাজী
বর্তমানে মুখরিত হয় বনি,
২৩ শে জানুয়ারী কী জয়–
নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বোস কী–জয়...
স্বাধীনতার মূল তুমি এই আমার কঠোরতর প্রত্যয়।

আজকের নারী

তনুশ্রী কালিন্দী

আজকের নারী তুমি
নির্ভীক লক্ষ্যে স্থির,
তুমি শিক্ষিতা, প্রতিবাদী,
আবার স্নেহময়ী।
তুমি কারো প্রেয়সী,
বড় অভিমানী, দাম্ভিক
কখনো বঞ্চিত ও লাঞ্ছিত।
ভাগ্যের পরিহাসে দগ্ধ
লড়াইটা থামিও না,
পুরুষ প্রধান সমাজটা
মাথা নত করবেই!
প্রত্যেক ক্ষেত্রে অংশ নেবে তুমি,
নারী পুরুষ হবে সমান,
সমাজটা এগিয়ে চলবে।

প্রার্থনা

রঞ্জনা চক্রবর্ত্তী, ইতিহাস বিভাগ, ২য় সেমি.

হায় বিধাতা! একি তব নিষ্ঠুর খেলা
দুষ্টের দমনে শিষ্টের পালনে
একি তব মহান লীলা চকিত মুহূর্তে
কেড়ে নিলে তোমার সন্তানের প্রাণ
করোনা মহামারী দিয়ে ভাবিলে না
এ সমাজ-সভ্যতা তোমারি দান।
জানি, জানি হে আমার বিধাতা
তুমিও কাঁদিছ নিরবে একা।
করিতে দুষ্টের দমন একি তব লীলা
সন্তানেরে ফেলিয়া পালায় মাতা
বাঁচিবার তরে, লেখা পাতা
জলাঞ্জলী এ বিশ্ব মাঝারে।
হায় প্রভু! একি তব লীলা করোনা
পাঠাইয়া ভবে দিলে সকলেরে জ্বালা।
স্নেহ, প্রেম প্রীতি মায়ার বন্ধন
যা দিয়ে তুমি রচিয়া ছিলে এ ভুবন
আজ একি তার করুণ পরিনতি ?
অনাহারে মরিছে আজ তোমারই সন্তান
ক্ষম দেব ক্ষম তাদের মাহাপাপ
রক্ষা কর এ ভুবন, দেহ অভয় দান।

ছোট্ট অভিমানী

পারমিতা দাস, এডুকেশান অনার্স

স্বপ্ন হাজার, ভাবনা কত ?
বলছি আমায় বলো,
লিখবো চিঠি মেঘের তটে
সাথে আমার চলো।
পুতুল পুতুল খেলা তোমার
দিন সারাটা দিন,
কি হলো আজ! মান হয়েছে ?
বুঝি বন্ধু কেনো বিহীন।
ডাকছে বাতাস ডাকছে আকাশ
জানালা খোলা দ্বারে,
চুপ করে আজ সারা সকাল
বসেই চুপি সারে।
চরকা কাটা চাঁদের বুড়ি
গল্প শোনাই বসো,
রাত হয়েছে মান ভাঙেনি
চাঁদ দেখাবো এসো।
চাঁদ তারা বেশ দেখেই খুশি
মান ভেঙেছে জানি,
নবীন সবার চোখের মনি
ছোট্ট অভিমানী।

স্কুল জীবনের স্মৃতি

পায়েল মলমল, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ২য় সেম.

ডাকছে বেঞ্চ ডাকছে স্কুল
ডাকছে বাগানের রঙিন ফুল
পুরানো সেই দিনের কথা
দিচ্ছে এখন মনে ব্যাথা।
সব কিছু ছেড়ে এলাম
পুরানো হল ব্ল্যাকবোর্ড
সময় হল স্কুল ছাড়ার
Please সবাই বেঞ্চ থেকে ওঠ।
কাটল কিকরে বারোটা বছর
পারলাম না তো বুঝতে
সেই বারো বছরের স্মৃতিগুলো আজ
পারছিনাকো ভুলতে।
স্কুলে যখন ভর্তি হলাম
কয়েকটা বন্ধু হয়েছিল সবে
ক্লাস ১২ এর পর সেই বন্ধুদের সাথে–
জানিনা কবে দেখা হবে।
টিফিন টাইমে বন্ধুদের সাথে
করতাম টিফিন শেয়ার...
সবকিছুই স্মৃতি হল,
সুযোগ নেই আর সেই দিনে ফিরে যাওয়ার।
যারা আমাদের বুঝিয়েছিলেন
কি হবে আমাদের ফিউচার
তাঁরা হলেন সেই মহানজন
স্কুল লাইফের টিচার,
তাঁদের যখন বললাম–
"স্যার/ম্যাম ভালো থাকবেন, এবার আসি"–
ছল ছল চোখে অল্প হেসে বললেন
"তোরাও ভালো থাকিস, কোনো সমস্যা হলে
সবসময় পাশে আছি।"
লন দিয়ে যাওয়ার সময়
রিমা দিল ডাক
বলল আমায় "ভালো করে পরীক্ষা দিস–
Best of luck."
স্কুল জীবনের শেষ দিনটায়
যখন চলছিল ক্রন্দন–
হঠাৎ করে হাসিয়ে দিল
দূরন্ত অঙ্কন।
অপূর্বটা বলল এসে
"কাঁদছিস কেন তোরা ?
হোকনা শেষ স্কুল লাইফ
কিন্তু বন্ধুত্ব হবেনা ছাড়া!"
একাশ শ্রেনীতে অফ পরিওডে
খেতাম লনে হাওয়া
তখন আমার সঙ্গী ছিল
শুধুই মহুয়া।
পার্থটা প্রত্যেকদিন বলত
'নমস্কার ম্যাডাম'
হাত নেড়ে রিয়া বলত
চলে আয় পায়েল তোর জন্য জায়গা রেখেছিলাম।
কম্পিউটার ক্লাসে বন্ধুত্ব হল
মনিকা মাইতির সাথে,
দুপুরবেলায় ক্লাস করে
ফিরতাম একই সাথে।
সৌমেনের সাথে করতাম মারপিট
Class-VII এ,
সাকলিনকে মারতাম ধরে
Class-XI-এ।
শেষ দিনেতে কমনরুমে
কাঁদো কাঁদো চোখে
শ্রেয়া বলল "সব বন্ধুরাই
থাকবে ফেসবুকে।"
তৃণা বলল এমনি করে
কাটবে দিন এক এক
বন্ধু তোরা ভুলিসনা যেন
করতে WhatsApp.
সময় যখন যানতে চাইতাম
পার্থপ্রতিমের কাছে
ও বলত একটাই কথা

পরের পাতায় .....
'দেড়টা পাঁচ বাজে'
অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করতাম
"মানেটা কি দেড়টা পাঁচের" ?
হেসে হেসে উত্তর দিত
'মানেটা আর কিছুই নয়
Just একটা কারণ ছোটো হাসি মজাকের।'
পড়াশুনার পাশাপাশি
আড্ডা হত কত...
"রাষ্ট্রবিজ্ঞানে তো পায়েল highest হবে"
বলত সুব্রত।
শান্তনুদার টিউশন যাওয়ার
সঙ্গী ছিল সুস্মিতা,
নদীর পাড়ে যেতে যেতে
হত কত কথা।
ক্লাস রুমটা যখন খুব লাগছিল খালি খালি
"বড্ড মন খারাপ লাগছে বল পায়েল ?"
বলেছিল সোনালী।
বললাম যখন 'আমি স্কুলটাকে ভুলতে পারবো না'
"আমারো এই একই অবস্থারে..."
বলেছিল সান্ত্বনা।
টিচারদের স্নেহ, ভালোবাসায়, বকুনিতে
হলাম কবে বড়ো...
সময় এখন বলছে আমাদের
"এবার স্কুল ছাড়ো"
বাধ্য হয়ে স্কুল ছাড়লাম
করার কিছুই নাই
I Love my School life
বলছি আমি তাই।

ভাইফোঁটা

সিমরান আখতার, প্রাণীবিদ্যা বিভাগ, ১ম বর্ষ

আচ্ছা দিদি বলতে পারিস
কে লিখেছে পাঞ্জি ?
তোরা সবাই যে যা বলিস
লোকটা বড় পাজি।
নইলে কি আর পাঞ্জিটা
সে এমন করে লিখতো
রোজই ভাইফোঁটা হলে
কি ক্ষতিটাই তার হতো!
কতলোকের আনাগোনা
হত আমাদের ঘরে
দই, মিসি আর সন্দেশ খেতাম
পেট ভর্তি করে।
দিদিরা সব দিত ফোঁটা
ভাইদের কপালে
আমি তখন নূতন নূতন জামা, জুতো
পরে থাকতাম সারাদিনে।
আমি যখন বড় হব
লিখব তখন পাঞ্জি,
দেখিয়ে দেব পাঞ্জি লেখা
কত সহজ, নইকো ফাঁকিবাজি।

আয়ো সরস্বতী

সুলতা সরেন, ১ম বর্ষ

আমগে আয়ো সরস্বতী
বিদ্যারিনীঃ রানি।
আমাঃ আশিষতে বেনাও ইঞমে
সারি অলঃ কুড়ি।।

সানাম বুদ্ধি পুঁথি মেনা
আমাঃ অন্তররে।
অনা তেগে আমদম তাহেন
অলঃ আখড়ারে।।

ইমিঞ মেগো বুদ্ধি আয়ো
ইঞিঞ এমাম বাহা।
ইঞাঃ দুলীড়খনদ আয়ো
একাল আলম সাহা।।

আমগে আয়ো অলঃরিনী
সারি দুলীড়িয়ে।
আম বেগর ইঞদ আয়ো
নিশ্বঃ উতীর গিয়ীঞ।।

বাংলা অনুবাদ

মা সরস্বতী

তুমি মা গো সরস্বতী
বিদ্যার রাণী।
তোমার বিদ্যায়
করো মা গো বিদ্যানী।।

সমস্ত জ্ঞানের ভাণ্ডার
আছে তোমার অন্তরে।
তাই তো সকল তোমায়
স্মরণ করে মন্ত্ররে মন্ত্ররে।।

তুমি দাও বুদ্ধি মা গো
আমি দেব ফুল।
তোমার ভালোবাসায় যেন
না হয় ভুল।।

তুমি আমার পথের আলো
তুমিই আমার প্রেমী।
তোমায় ছাড়া আমি যেন
মনিহারা ফণি।।

কালো মেয়ে

ইলা নন্দ, অধ্যাপিকা, সংস্কৃত বিভাগ

কাজল কালো কাজলা মেয়ে
আসমানে তোর কতই খেলা–
তোর রূপের ছটায় বিজলী খেলে
জলে ভাসাস্ মরণ ভেলা ?
কখনো যাস্ পূর্বে পশ্চিমে
পাগলা নদীর দেশে
শাল-পিয়ালের দেশে আসিস
অঝোর ধারায় মেতে–
শস্যক্ষেত্র-জনবসতি
ডুবিয়ে দিয়ে উড়ে চলিস্
কতো গাছপালা উড়িয়ে দিয়ে
আবার নতুন বসত্ গড়িস,
ঈক্ষণে তোর বাজে বিষাণ
চতুর্দিকে ভয়াল করিস্,
একি খেলা করিস সদা
কাজল কালোর ওরূপ ধরি!
এবার উষ্ণায়ণে উড়ে যাবি তুই
শীত বর্ষাও ভুলে যাবি,
তাই বুঝে-সুঝে জল দিবি তুই
আর সকলের মন কুড়িয়ে নিবি।

মা দুর্গা

বর্ণালি চ্যাটার্জ্জী, মিউজিক, ৪র্থ সেম.

শরৎ কালে শিশির পড়ে
শিউলি ফোটে গাছে
পদ্ম ফোটে জলের উপর
কাশ ফোটে মাঠে।
এই রূপেতেই মা আসেন
মর্ত্যে সবার কাছে
মা যে আমার ঘরের মেয়ে
থাকে সবার মনে
সঙ্গে আসে কার্তিক গণেশ
লক্ষ্মী সরস্বতী
তাই তো আমরা সবাই
উঠি আনন্দেতে মেতে।

অসুখ

অনুরিমা মাহাত

প্রকোপ বেড়েছে অসুখের, তাতে বেড়ে গেছে আরও লুল্লোড়
রাষ্ট্রের চিন্তায় শুধু, কারা শ্রীরামের বনি তুললো।
আর বাকি কিছু বুঝবে না কেউ। পড়বে না ধরা ফন্দি
পাঁচ একরেই মসজিদ হবে। রাম খুঁজে নেবে মন্দির
হিসেব থাকে না ফাণ্ডের, তবু লাগবে না তাতে খটকা,
জিডিপিটা যদি সন্ত্রাস হতো, বেড়ে যেতো এক ঝটকায়।
পেটে জ্বালা থাক কৃষকের। তবু মুখে রাখা থাক ফুর্তি,
কোটি টাকা দিয়ে গড়ে দিয়ে যাবে দেখবার মতো মূর্তি
বিভাজন হবে ধর্মের। আর প্রতিবাদ হলে নিন্দে,
রাম জানে কারা নাগরিক, আর কারা চলে যাবে ভিনদেশ।
প্রকোপ বেড়েছে অসুখের। তাতে বেড়ে গেছে আরও হুল্লোড়
ধর্মের এই ভাইরাস, ওঁরা মহামারী করে তুললো।

পথচলা

সুষমা রানী সাউ, ফিজিওলোজি, ৬ষ্ঠ সেমিস্টার

চলতে শেখার শুরু থেকেই ভাবতাম,
কবে শেষ হবে আমার জীবনের এই পথচলা ?
দূরন্ত আশা আমার মনে, তাই এত কষ্ট করা।
যতই এগোই ততই দেখি–
সে পথ যেন দিগন্ত ছাড়িয়ে গেছে।
শুধু এটাই ভেবে চলছি যে,
কোনোদিনতো সেই বড়ো রাস্তায় পৌঁছোনো...
আর তারপর,
তারপর আমার সেই উদ্দেশ্য পট,
যা আমি খুঁজে ফিরি, যার জন্য আমি অপেক্ষারত।
কিন্তু সেই বড়োরাস্তাটা কোথায় ?
কোথায় বা সেই স্বপ্নের দেশ ?
প্রতি পদক্ষেপে এই প্রশ্নগুলি উঁকি দিয়ে যায় আমার মনে।
কখনও বা প্রশ্নের দোলার ঝোঁকে টলমল করে পা!
জীবনের এই অলিগলিতে, কোথায় যেতে চাই
মাঝেমাঝে সেটাই ভুলে যাই!
প্রতিটি মোড়ে আরও একটা রাস্তা।
যেখানে থাকে অনেকেই..., যারা বলে–
এই দিকে যাও পৌঁছে যাবে, ঐ দিকে যাও পৌঁছে যাবে,
কিন্তু কেউই সাথে আসে না!
জনাকীর্ণ রাজপথও তখন বিজন লাগে।
আবার মোড়, একাই হাঁটি।
পথেদের এই গোলকধাঁধায় আমি যেন এক পথহারা পথিক,
কিংবা মাঝসমুদ্রের এক দিকভুল নাবিক।
এই মোড় ঘুরে ঘুরে আবার ভাই আগের জায়গায় এসে পড়ি!
ক্লান্ত শরীর প্রশ্ন করে, "আরও কত দূর ?"
সেটার সন্ধান তো পেলাম না।
মনে ভাবি, আমার আর বড়োরাস্তায় যাওয়া হবে না!
মাথা নুইয়ে, হাঁটু গেড়ে বসে পড়ি নীচে।
প্রখর রৌদ্রে চোখ বুঝলে অন্ধকার দেখি,
অস্পষ্টতা কাটিয়ে আস্তে আস্তে তাতে ভেসে ওঠে
ঘামে ভেজা, রোদে পোড়া,

আমার বাবা মায়ের লাল মুখগুলি।
আমাকে নিয়ে কত আশা তাদের চোখে...
অথচ আমি কিছুই করতে পারলাম না
চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়ে ... পৃথিবীটা আজ নিশ্চুপ।
হঠাৎ তখনই, কে যেন ডেকে বলে,–
"থেমে গেলি কেন ? ওঠ, অনেকটা যেতে হবে যে..."
চমকে উঠে চোখ তুলে সামনে তাকাই,
দেখি রাস্তার অন্য ধারে একটা মাইল ফলক।
ডানদিকে তীর চিহ্ন দিয়ে তাতে লেখা আছে–
"স্নাতক নগর / ১ কিলোমিটার"।
চোখ উজ্জ্বল হয়।
"স্নাতক" নামটি আমি আগে শুনেছি,
ঐ খান দিয়ে বড়ো রাস্তায় যাওয়া যায়।
এমন সময় এই রৌদ্রেও শরীরে শীতলতা অনুভব করি।
অবাক হয়ে উপরে চেয়ে দেখি
পাশের বটগাছটি তার ডালপালা ছড়িয়ে দিয়েছে
আমার মাথার উপর, ছায়া দিচ্ছে আমায়।
হৃদয়ে প্রশান্তি নামে।
না, এখন আর আমি দিকভুল করবো না,
এখন আমি আর ক্লান্ত হবো না।
চোখ বন্ধ করে স্থির হই, অনুভব করি–
শুধুমাত্র একটা জায়গায় পৌঁছোনোই জীবনের উদ্দেশ্য নয়,
ঐখানেই জীবনের শেষও নয়, ...জীবন প্রবহমান...
এই নিরবচ্ছিন্ন চলার মধ্য দিয়ে হবে নতুন দেখা, নতুন জানা,
হবে পৃথিবীর সাথে পরিচয়,
হবে মাটির সাথে দোস্তি।
একটা নতুন পথের খোঁজ,
একটি নতুন মাইলফলক প্রতিষ্ঠা।
মৃত্যুতেও পরিসমাপ্তি ঘটেনা এমন জীবনের...
একের প্রতিষ্ঠিত মাইলফলক পথনির্দেশ করবে অন্যকে,
স্মরণে আসবে, আবারও পুনরুজ্জীবিত হবে সে।
জীবন আবিষ্কারের...
কখনো বস্তুজগৎ, কখনো বা নিজেকেই নতুন ভাবে, নতুন রূপে।
অনুভব করি,
একটা স্বপ্ন পূরণই জীবনের চরম স্বার্থকতা নয়,
আবার স্বপ্নও সবসময় সঠিক বা সুন্দর নয়।

বাস্তবও হতে পারে স্বপ্নের চেয়ে অধিক শ্রেয়, গ্রহণযোগ্য, মঙ্গলকর।
থেমে যাওয়াই অপূর্ণতা,
অসীম আনন্দ ও স্বার্থকতাতো অশেষ চলতে পারায়...
আর একলা চলার পথে এই মাইলফলক,
যা সঠিক পথের সন্ধান দেন, এই বটগাছ
যার ছায়ায়, হাওয়ায় আমরা বড়ো হই, পুষ্ট হই...
এঁরা আমার শিক্ষক শিক্ষিকা,
দিকভুল নাবিকের কম্পাস, ছাত্রজীবনের আশ্বাস,
আমার অনুভূতির খোরাক।
বিভেদ-বৈষম্য ভুলে, সাম্যের গান গেয়ে
সুবিচারের মান আর সত্যের ধ্যান করতে শিখিয়েছেন যাঁরা,
তাঁদের প্রণাম জানাই।
উজ্জীবিত হই, উচ্ছ্বাসিত হই,
নতুন উদ্যম প্রাণে নিয়ে উঠে দাঁড়াই–
উদ্ভাসিত আলোয় প্রাঞ্জল দৃষ্টিতে তাকাই রাস্তার দিকে,
আমি আবার পথ চলি...
একজন ছাত্র থেকে একজন শিক্ষক হয়ে ওঠা পর্যন্ত,
মাইল ফলক পড়া থেকে মাইলফলক গড়া পর্যন্ত,
আশ্রয় পাওয়া থেকে নিজে একটি আশ্রয়স্থান হয়ে ওঠা পর্যন্ত,
যুগের শুরু থেকে যুগান্তর পর্যন্ত এবং তারও পরে–
এই পথচলা চলবে...।

করোনা

জয়শ্রী ঘোষ

আতঙ্কিত!
আতঙ্কে
সামাজিক জগৎ।
করোনা কারও নয়,
সীমান্ত প্রাচীরে।
রোগটা নাকি বড্ড ভারী!
'আমদানি' চলছে–
দেশে-বিদেশে।
গরীব মানুষগুলো
সমাজে খুব সচেতন।
কিন্তু যাদের সচেতনতা
সমাজকে আক্রান্ত করার
হাত থেকে বাঁচাতে পারতো,
তারা কি সচেতন ?
না, সব জেনেও
'যাক না জগতটা উচ্ছন্নে'–
এইভাবে কীছু দামীদের!
নিজেদের ভালো ছাড়া
আর কিছু বোঝেনা যারা।
ইবোলা-এবেলা-মার্স-সার্স
ডেঙ্গু-সোয়াইন ফ্লু!
সব হয়ে গেছে
কমজোরি–
করোনা করেছে গাঁ উজাড়ি।
ওটা নাকি বড্ড ভারি।

প্রত্যাশা

কণিকা পাত্র, প্রাণীবিদ্যা বিভাগ, ৬ সেম.

কিছু স্বপ্ন কিছু আশা আকাঙ্খা নিয়ে
ভর্তি হয়েছিলাম রাজা নরেন্দ্র লালা খান ওমেন্স কলেজে
বেশ ভালই চলছিল ক্লাস
সঙ্গে ছিল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান,
কলেজ ফাঁকে আড্ডা
ক্যান্টিনে খাওয়া দাওয়া
ম্যাম ও স্যারদের কাছে মাঝে মাঝে ক্লাস না করার আবদার,
ক্লাস এর মাঝে কখনো হাসি
ঠাট্টা এবং তাদের সুমিষ্ট ব্যাবহার
সবই আজ হচ্ছে রমন্থন,
করোনা ভাইরাস সব স্মৃতিকে করলো বিস্মৃতি,
সব হাসি আনন্দ, পড়াশোনার একটা ছন্দ কে করল নিরানন্দ
ফিরে পাবো না ফেলে আসা দিনগুলিকে।
সময় এগিয়ে যায়...
স্মৃতি অতল তলে মজে থাকে,
মাঝে মাঝে উকি দেবে
পুরনো সেই দিনের কথা।
আশা রাখি সেই পথ যেনো না হয় কণ্টকাকীর্ণ
যেনো সেই পথ হৃদয় কে না করে বিদীর্ণ
পুরানো ও নতুন সব কে নিয়েই আমাদের যেতে হবে
এগিয়ে ভবিষ্যতের পথে,
সমস্ত স্যার ম্যাম দের আশীর্বাদ যেনো সর্বদা থাকে
আমাদের সাথে।

Lost and Found

Ankana Mallik,

Mathematics Department, 2nd Sem.

When I Lost cousage,
I found a hand to encourage me.
When I lost the way to my destination
I found a shadow showing me path.
when I lost hope and joy
I found a smile giving me happiness,
When only I kept dreaming.
I found a mind to Fulbil desires.
When I stared to lost my Treasure.
I Found a willing heart to help me.
But when I succeded in life.
I found the person how here.
At last, when I fell loney again.
I found, some one to fill my heart.

ভ্রমণ কাহিনী

সুজাতা চক্রবর্তী, ইতিহাস অনার্স, ৩য় সেমিস্টার

সবে পরীক্ষা শেষ হয়েছে। হঠাৎ অচেনা অতিথির গৃহে আসার মতো স্থির হল আমাদের ভ্রমণস্থল আগ্রার তাজমহল। প্রস্তুতিপথের পর আমরা সেশনে পৌঁছোই। রেলগাড়ি আসে অতিপরিচিত বনি নিয়ে। ট্রেনের কামরাতে আমরা সপরিবারে অবস্থান করি। তাজমহল ভ্রমণস্থল হিসেবে স্থির হওয়ার পর থেকে আমার রাতের ঘুম উড়ে যায়। কেবল রবীন্দ্রনাথের 'শাহজাহান' 'সাজাহান' যাই হোকনা কেন, নামে কি আসে যায় তবুও সেই কবিতা উচ্ছলিত তরঙ্গের মতো আমার মনের বেলাভূমিতে আছড়ে পড়তে থাকে পলঅনুপলে। স্বপ্নের ঘোর আসে এই বুঝি প্রত্যক্ষ করছি সেই পৃথিবীর সপ্তম আশ্চর্যের অন্যতম এক বিস্ময়। ট্রেনে সোনাক্ষী নামে একজনের সাথে পরিচয় হয় সে সীমান্ত রক্ষার কাজে অংশগ্রহণের চেষ্টায় আছে। তার মা-গতবছর মারা গেছে, বাবা শৈশবেই পরলোকগত হয়েছেন। এক ছোট্টো বোন ছিল সে বিবাহিত। সোনাক্ষীর কোনো পিছুটান নেই।

সে আমাকে কেবলি বলতে থাকে এইভাবে চলতে চলতে পৌঁছে যাবি তোর সেই স্বপ্নমেদুর তাজমহলের কাছে। তাজমহল যেন অমরার শিল্পরীতির এক অপূর্ব কুসুমকোরক। আমরা দিল্লী পৌঁছোই। বিশ্রামের পর বেরিয়ে পড়ি অবশেষে সেই শুভ্র, মর্মর সেই স্থাপত্যরীতির অঙ্গনে পৌঁছে যাই। সেদিন ছিল কোজাগরী পূর্ণিমা, স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নার অপূর্ব রূপোলি কিরণ ছড়িয়ে পড়েছে চারিদিকে। আর সেই মর্মর অতি অপরূপ 'শিল্পশোভার সার' টিও যেন উদ্ভাসিত হয়েছে মায়াময় রূপভঙ্গীতে। সাহজাহান তাঁর প্রিয়তমা পত্নী মমতাজের স্মৃতির উদ্দেশ্যে এই অপূর্ব সৌধটি নির্মাণ করান। মনে পড়ে সেই অমরকবিতা–

"কালের কপোলতলে শুভ্র সমুজ্জ্বল / একফোঁটা চোখের জল / এ তাজমহল"

এছাড়াও 'জাহাঙ্গীর মহল' প্রত্যক্ষ করি যেখানে অসুস্থ শাহজাহান বন্দী অবস্থায় ছিলেন। যমুনা নদীর জল বয়ে যাচ্ছে। যমুনা নদীর সেই বয়ে যাওয়া যেন অতীত মননে উঠে আসা অমল স্তূপের ধৌতকারী এক প্রবাহ।

পরের দিন আগ্রা দূর্গের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। আগ্রা দূর্গ পরিদর্শন করার পর আকবরের রাজধানী 'ফতেপুর সিক্রি' প্রত্যক্ষ করলাম এবং মুঘল আমলের নানা চিত্র ও শিল্পরীতি প্রত্যক্ষ করলাম।

এছাড়াও দিল্লির মিউজিয়াম দর্শন করলাম যেখানে নানা তথ্য সম্পর্কে অবগত হলাম। তারপর আমরা আমাদের বিশ্রামস্থলে উপস্থিত হলাম।

তাজমহলের সেই দৃশ্যান্তরের কথায় পুনরায় ফিরে গেলাম তাজমহল প্রত্যক্ষ করার পর সেই গুরুগম্ভীর পরিবেশ। মনে হল ট্রেনে পরিচয় হওয়া সোনাক্ষীর কথা। শান্ত ও ভদ্র স্বভাবের হওয়ার জন্য মা, বাবাও খুব আপ্যায়ণ করলেন সোনাক্ষীকে ট্রেনে। 'ক্ষণিকের অতিথি'র মতো পরিচিত হওয়া সোনাক্ষী দিল্লিতে নেমে আমাকে বিদায় জানাল। আমার মনের কোণে এক বিষাদ সুন্দর অনুভূতি হল সোনাক্ষীর কোনো পিছুটান নেই আর বৃদ্ধ বয়সের শাহজাহানও তাজমহলের কথা মনে এল শাহজাহানেরও কোনো পিছুটান নেই।

বিষাদঋণ এক পরিবেশ। এই তাজমহলকে নিয়ে কত কবিতা, কত মন পাগল করা গান রচিত হয়েছে তা আজ প্রত্যক্ষ করছি মনের আয়না দিয়ে। কত পর্যটক পরিভ্রমণে এসেছেন এই তাজমহলের। কালের কপোলতলের আঘাতের কোন চিহ্ন তেমন না ফুটে উঠলেও এর ঔজ্জ্বল্য এখনও মনোলোভা। এছাড়াও সম্রাটদের সমাধিক্ষেত্র দেখলাম যেখানে মহানিদ্রায় মগ্ন সম্রাটের পরিবারের লোকজন। সত্যি 'কত আশা সাধ মিশে যায় মাটির সনে' একফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ল। আমরা সবাই স্মৃতিমেদুর হয়ে পড়েছিলাম আর মনের অজানাখীগে ভেসে আসছিল নজরুলের গানের সেই শব্দব্রহ্মগুলি– "দিতে এলে ফুল কে আসি সমাধিতে মোর। এতদিনে কি আমারে পড়িল মনে

মনোচোর"

দিল্লীর সেই অপূর্ব সুন্দর ঐতিহাসিক স্থানগুলি ক্রমে ক্রমে ঘুরলাম। দিল্লীর গহ্বরে এক অত্যাশ্চর্য সভ্যতার ধূলিকণা যেন প্রতিটি শিল্প স্থাপত্যের অন্দরে বিদ্যমান। জীবন নদী বয়ে যায়। সময়ের নৌকোতে পাল তুলে আগ্রা শহরটি আমরা পরিভ্রমণ করলাম এবং নানা যুগের শাসনকালের এক চিহ্ন যেন প্রতিবিম্বিত হয়েছে। যমুনা নদী যে নদী নানা সভ্যতার উত্থান পতনের এক নিঃস্বার্থ সঙ্গী। মোঘল সাম্রাজ্য, সুলতানি সাম্রাজ্য শূর শাসন, শাহজাহানের প্রেমপূর্ণ অঞ্জলী, ঔরঙ্গজেবের মতান্ধতা, বৃদ্ধি ও অসহায় শাহজানাহের করুণ সময়– এসবের সাক্ষীস্বরূপ অতন্দ্রপ্রহরীর মতো অনবরত সক্রিয় যমুনা নদী। এছাড়া কুতুবমিনার দূর্গ যা ভিন্ন এক স্থাপত্যকলার নিদর্শন।

সময়ের সীমারেখা পারেমহাকলি বয়ে যার, সভ্যতার মিনার পাংশু হবে হয়তো তবু একার্তি রয়ে যাবে, রেখে যাবে কত অনুভূতি। আকাশের বুক চিরে তখন কত শিমূল, পলাশের লাল রং ছড়িয়ে পড়েছে গোধূলিলগ্নের এক অপূর্ব, মনোহর নিস্তব্ধতা আর ঐতিহাসিক শহরের নানা চিত্র মনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। আমরা হোটেলে পৌঁছোই। পরের দিন সকালে ফেরার পালা। সেই প্রথাগত জীবনে নিঃশব্দে প্রবেশ করতে হবে এবার। তাই শেষবারের মতো আমরা সপরিবারে পুনরায় গিয়েছিলাম তাজমহল প্রত্যক্ষ করার জন্য। দেশজুড়ে হানাহানি, লাঠালাঠি, সাম্প্রদায়িকতা কেবলই। এ সৌন্দর্য্যের আকর দেখে মনে হয় এ শিল্পীর Perfection, হৃদয়ের অঞ্জলী সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্পের বুদবুদ এখানে পৌঁছোবে না।

সেখান থেকে ফিরে আসার সময় হয়। মস্তক অবনত হয় হৃদয়গহনের দ্বারে কে যেন বলে ওঠে–

জীবনের পথমাঝে চড়াই, উতড়াই কতশত,
সুনামীর ঢেউ সেও তো অলীক নয়,
তবু সৌন্দর্য্যসৃষ্টনার শিল্পদ্যুতির
টুকরো কোলাজ থাক,
ভরা থাক মনের নিঃসীম নীলিমায়।'

পরের দিন প্রাতঃকালে ফেরার পালা। ট্রেন আসে জীবনের এক পথবাঁকে না অনুভূতির পথ বাঁকে, সেই শব্দচেনা শব্দ নিয়ে।

পত্ররচনা

রিম্পা চ্যাটার্জী, বাংলা সাম্মানিক, তৃতীয় বর্ষ

বিষয় ঃ মা-এর কাছে মনের অনুভূতি জানানো।

চন্দ্রকোনা, পশ্চিম মেদিনীপুর
তাং- ১৩.০২.২০২০

শ্রীচরনেষু মা,

পত্রের প্রথমেই তুমি আমার প্রণাম নিও। কেমন আছো তুমি ? অনেকদিন হয়ে গেল তোমায় দেখি না। জানি না কেন মাঝরাতে ঘুম ভেঙে যায়, তোমার কথা মনে পড়ে। আজ এই পত্রের মধ্য দিয়ে আমি তোমাকে আমার মনের কিছু তোমার অজানা অনুভূতি ব্যক্ত করছি। জানি না মা কোনো ডাকঘরের পিওন এই পত্র তোমার কাছে পৌঁছে দিতে পারবে কি না। মা ও মেয়ের সংস্পর্শের অনুভূতি তোমার কাছে পৌঁছে দেবে কি না ? তবু আজ খুব ইচ্ছে করছে আমার মনের কিছু কথা তোমাকে জানাতে।

মা, মা, মা– বাড়ি ফিরেই তোমাকে খোঁজার বৃথা চেষ্টা আজও করি। স্কুল থেকে ফেরার পথে রাস্তা থেকেই যখন তোমাকে মা, মা করে ডাকতাম আর তুমি বাড়ির বাইরে বেরিয়ে আসতে। তোমার কথা খুব মনে পড়ে মা। কলেজে পড়ার জন্য বাইরে চলে আসার পর থেকে কেন জানি না তোমার সাথে সংযোগ অনেকটাই নেই বললেই চলে, জানি না অন্য কারোর তাঁর মায়ের সাথে কেমন সংযোগ। আমি জানি তুমি আমাদের দুই বোনের জন্য অনেক কিছু করেছ, আজও করে যাচ্ছ, কোনোদিন ভাবিনি আমি কলেজে পড়তে পারব। আমি জানি তুমি হইতো এই পত্র পড়ে ভাববে কেন আমি এইসব কথা লিখেছি। কেন জান, আমার মনের মধ্যে গত কয়েকমাস ধরে এক দ্বন্দ্ব চলছে। কেন জানি না আমার মনে হচ্ছে তুমি আমার থেকে অনেক দূরে চলে গেছো, আগের মতো আর তোমার কোলে মাথা রেখে মনের কথা বলতে পারিনা। আগের মতো আমার মন খারাপ হলে তুমি আমার কাছে এসে বসো না কেন মা ? কেন আর আমার সাথে বেশিক্ষণ কথা বলো না ? কেন তুমি আমার সাথে সময় কাটাও না মা ? আমি জানি না আমি তোমাকে ঠিক বলছি না ভুল। কিন্তু আমার মধ্যে থাকা এতদিনের কষ্ট যন্ত্রণা ভেবেছিলাম তোমায় বলব না। হয়তো কোনোদিন তোমার সামনে বসে বা দাঁড়িয়ে আমি বলতে পারতাম না কোনোদিন। তাই এই পত্রের মধ্যে লিখলাম। আমি জানি তুমি ভাববে, আমি হইতো ভুল ভাবছি কিন্তু আমার মন, আমার আত্মা, আমার ভাবনাকে আমি কি করে বদ্ধ করে রাখব বলো। আমি কি করব বলো, মা ? আমার মনে যে তুমি কতটা জায়গা জুড়ে আছো হয়তো তুমিও জান না। আমার জীবনে তোমার স্থান আমার জীবনের সবকিছুর উপরে। আমি তাই তো আজও রাতে বালিশে কোনো মাথা রেখে কাঁদি। জানি না এই পত্রটা পাওয়ার সময় তুমি কি করবে বা ভাবে। তবে মা আমি তোমায় কোনোদিন বলব না তুমি আমার কথা ভাব শুধু আর কোনোকিছু নয়। আর সবকিছুকে তুমি উপেক্ষা করো। কিন্তু সবকিছুর মধ্যেও আমাকে একটু সময় দিও না, আমাকে একটু তোমার কাছে টেনে নিও দেখবে আমার মনের মত দুঃখ, কষ্ট, বেদনা সমস্ত কিছুই একমুহূর্তে ধুয়ে মুছে সাদা কাগজের মতো হয়ে গেছে। আমার বাইরে থাকি, আমারও তোমাকে প্রয়োজন হয়। সেটা কি তুমি বোঝো না, কেন সারাদিন চলে গেলেও তুমি আমায় ফোন করো না ? কেন মাঝে মাঝে আমার ফোনে তোমার ফোনের নম্বর ভেসে ওঠে না। তাছাড়া সেদিন যখন আমার কলেজের প্রথম বর্ষের রেজাল্ট বেরোলো খুব টেনশনে ছিলাম, ৬১% নম্বর পেলাম। সবার প্রথমে তোমায় ফোন করলাম, আমি তো খুশি হয়েছিলাম। কিন্তু

তোমায় ফোন করার পর তুমি বললে– 'এটা নম্বর হল না কি! মেসে থেকে কি করিস ? পড়াশোনা করিস না ? সারাদিন আমরা কাজ করে শুধু শুধু জন্য টাকা নষ্ট করছি।'– এটা বলে তুমি ফোনটা কেটে দিলে। আমার কথা কিছু শুনলেই না। একবারও কি তুমি ভালো করে কথা বলতে পারতে না। হ্যাঁ, হয়তো এই নম্বরটা তোমার ভালো লাগেনি। হ্যাঁ। হইতো এই নম্বরটা কম। কিন্তু তা বলে তোমাকে এইভাবে কথা বলতে হত। আমি তোমায় কিছু বলতে পারিনি। কিন্তু মা আমার মাঝে মাঝে খুব কষ্ট হয়, বুকের মধ্যে যেন যন্ত্রণা হতে থাকে। কিন্তু তোমায় বলতে পারি না। কি করে বলব বলো, এখন যে তোমায় কিছু বলতে গেলে ভয় লাগে। পাঁচ বার ভাবি তোমায় বলব কি না। মা, আমার খুব একা লাগে। তুমি তো মা বলো, আমার মুখের হাসির পেছনে যে কষ্টটা আছে সেটা তো তুমি বুঝতে পারবে বলো, কিন্তু কোথায়, কোথায় মা ?

মা, আমি খুবই দুঃখিত তোমাকে এইসমস্ত কথা বলার জন্য। আমি যে ক্লান্ত মা। নিজের মনের সাথে যুদ্ধ করতে করতে আমি ক্লান্ত। তোমাকে এইসমস্ত কথা কোনোদিন বলব না ভেবেছিলাম। কিন্তু আজ আর নিজেকে আটকাতে পারলাম না, নিজের দুঃখগুলো। অনুভূতিগুলো জানিয়ে দিলাম এই পত্রের মাধ্যমে। জানি না এত কিছু বলার পরে তুমি কিরকম ভাবে কথাগুলো নেবে। জানি না তুমি আবার আমার ওপর রেগে যাবে নাকি। আমি জানি না আমার এই ভাবনাগুলো ঠিক না ভুল, তবু লিখলাম। কিছু মনে করো না। আমি আমার জীবনের কিছু অন্তর মুহূর্ত প্রকাশ করলাম। জানি হয়তো সময়ের সাথে সাথে সব ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু আমার জীবনে তোমার প্রয়োজন অনেক বেশি। মা, যদি তোমায় আমার মনের অজান্তে কষ্ট দিতে থাকি তার জন্য দুঃখিত। তুমি কেমন আছো জানিও, দিদি কেমন আছে, যদি তোমার কিছু বলার থাকে সেটাও পত্রের মধ্য দিয়ে জানিও। আমি ভালো আছি মা। আবার হয়তো জানি না কেমন আছি। পত্রের শেষে তুমি আমার প্রণাম নিও।

ইতি–
তোমার স্নেহের
রিম্পা

মেদিনীপুর
পশ্চিম মেদিনীপুর

পত্ররচনা

সুজাতা চক্রবর্তী, ইতিহাস অনার্স, ৩য় সেমিস্টার

তারিখ- ১৩ ফেব্রুয়ারী, ২০২০
সুজাতা চক্রবর্ত্তী
আন্দুল, হাওড়া, ৩৭২১১১

প্রিয়,
সংঘমিত্রা

সংঘমিত্রা অনেকদিন পর চিঠি লিখছি। মাসিমা, মেসোমশায়কে আমার প্রণাম দিস, তুই আমার অন্তরের ভালোবাসা ও শুভেচ্ছা নিস। সাম্প্রতিককালে মহাবিদ্যালয় থেকে ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপিকাদের সাথে এক শিক্ষামূলক ভ্রমণে গিয়েছিলাম তা তোর সাথে ভাগ করে নিতে চাই।

শিশিরস্নাত শীতের এক সকালে রৌদ্রকিরণ গায়ে মেখে বেরিয়ে পড়ি। আমরা পৌঁছে গিয়েছিলাম বুদ্ধগয়ায়। যেখানে তরুণ সিদ্ধার্থ সংসারের ত্রিতাপ জ্বালা থেকে মুক্তি পাবার জন্য সাধনায় মগ্ন হয়েছিলেন। সেই সাধনস্থলের কাছাকাছি তথাগত বুদ্ধের এক মর্মর মূর্তি, এ যেন মূর্তি নয় করুণাঘন এক মহাপ্রাণ।

তারপর মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা অর্থাৎ আমাদের ইতিহাসে শিক্ষিকারা বুদ্ধদেবের অসামান্য জীবনকাহিনী সংক্ষেপে বর্ণনা করলেন। শিক্ষিকাদের বর্ণনা শুনেও সেই অপূর্ব, হৃদয় আলোড়িত স্থান প্রত্যক্ষ করে আমরা কেউ কেউ 'প্রাণের আরাম মনের শান্তি' খুঁজে পাই। সেখান থেকে ফিরে এসে আমরা মানিক নামে এক হোটেলে বিশ্রাম নিই ও মধ্যাহ্নভোজন সারি। অপরাহ্নের সময় আমরা বেরিয়ে পড়ি নালন্দা মহাবিহারের উদ্দেশ্যে। নালন্দা বিহার হাজারো বংসের স্মৃতি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এই স্থানে অতীতে সহস্রাধিক অধ্যাপক শিক্ষাদান করতেন, ও সহস্রাধিকের বেশী অনেক ছাত্র শিক্ষাগ্রহণ করত। কালের কপোলতলের নখরাঘাতে নালন্দা বিহারের দেহে প্রকট বিলীন হওয়ার নানা চিহ্ন। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট এক স্থানে চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙের পুণ্যস্মৃতিতে নির্মিত হয়েছে এক স্মৃতিমন্দির। ইতিহাসের ধূসর জগতে হারিয়ে গিয়েছিলাম আমরা সবাই। এক দূর অনাগত বনির মতো স্মৃতিপটে উদিত হচ্ছিল পুরাকালের সেই গুরু শিষ্যের অধ্যয়নপ্রণালী, বিভিন্ন বিদেশী পর্যটকদের নালন্দা মহাবিহারে আগমনের নানা টুকরো কাহিনী। মনে পড়ে কবিগুরুর সেই মনপাগল করা লাইন– 'হে অতীত কথা কও'।

আমরা ফিরে আসি এবং বুদ্ধদেব যে বৃক্ষতলে বসে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন সেই স্থানে আমরা যাই। বুদ্ধদেবের অষ্টাঙ্গিক মার্গ এবং অহিংসার ফণী ও তাঁর জীবনচরিত আমাদের অনুধাবন করাতে সমর্থ হন আমাদের বিভাগীয় প্রধান ও আমাদের শ্রদ্ধেয়া ম্যাম।

এছাড়াও জাপানের আনুকূল্যে নির্মিত বৌদ্ধমন্দিরটিও আমরা পরিদর্শন করি। শ্যাম, থাইল্যাণ্ড, জাপান প্রভৃতি দেশের তীর্থযাত্রীদের বুদ্ধমন্দিরে প্রত্যক্ষ করি। মনেমনে ভাবনারা পূর্ণতা পায়–

অসীমের লীলাভূমি কোথায় কতদূরে তা জানি না;
জানি না, হয়তো এই ধরাতলে হয়তো এই ধূলির স্বর্গে।

মন প্রশান্তিতে ভরে গেল। তারপর সূর্যের মোড়ক ধীরে ধীরে গুটিয়ে নিচ্ছে তার আভা, কিরণসন্ধ্যা আগত প্রায়। বৌদ্ধ মন্দির থেকে নিঃসারিত সেই বনি– 'বুদ্ধং স্মরণং গচ্ছামি, সংসং স্মরণং গচ্ছামি ধর্মং স্মরণং গচ্ছামি'– আকাশ

বাতাস মথিত হল যেন। হৃদয়ে ফল্গু নদীর স্রোতধারার মতো এক অনুভূতির সৃষ্টি হল। সন্ধ্যাতারাদ্বীপ জ্বেলে সন্ধ্যাকে বরণ করছে নম্রনীল ওই আকাশ, নিস্তব্ধ, এক পরিবেশ সব মিলিয়ে কেটে গেল আরো দু ঘন্টা। শিক্ষিকারা আমাদের হোটেলে ফিরে যাবার জন্য প্রস্তুত হতে বললেন। এবার ফেরার পালা সবার মনের এক অনুভূতি– 'বিদায় সন্ধ্যা আসিল ওই।'

তুই পারলে বুদ্ধবিহার অর্থাৎ গয়া ঘুরে নিস। তাহলে খুব ভালো লাগবে। শ্রেনীকক্ষে পাট, আর প্রত্যক্ষ করে অনুভূতির যে খেলা আমরা ভাসিয়েছিলাম ওই দিন তার উপযোগীতা এক ছাত্রজীবনে অপরিহার্য।

এই ছোট্ট ও একান্ত ভালোলাগার অনুভূতি তোর সাথে ভাগ করে ভালো লাগল। তোর পরীক্ষার ফলাফল জানাস পরবর্তী চিঠিতে। আমার প্রীতি ও শুভেচ্ছা নিস ও অবশেষে মাসি, মেসোমশাইকে পুনরায় প্রণতি নিবেদন করি। তোর খবর দিস, খুব ভালো থাকিস।

ডাকটিকিট

সংঘমিত্রা মুখার্জ্জী
প্রযত্নে, সমুদ্রনীল মুখার্জ্জী
বিধান চন্দ্র সরণী, কোলকাতা,
৭০০০০২

ইতি–
তোর একান্ত প্রিয়
সুজাতা

পত্ররচনা

পাপিয়া জানা, বাংলা অনার্স, ২য় সেমিস্টার

'বৃক্ষরোপণের প্রয়োজনীয়তা' নিয়ে আমাদের কলেজে একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সেই সেমিনারের বিষয়বস্তু নিয়ে বান্ধবীকে চিঠি লেখা।'

তারিখ- ১৩ ফেব্রুয়ারী, ২০২০
জায়গা- মেদিনীপুর
গোপ প্যালেস
পিন-৭২১১০২

প্রিয় বান্ধবী পিঙ্কি,

অনেক দিন তোমার কোন খবর পাই নি। আশাকরি ভালোই আছো। কাকু, কাকিমা, ভাই কেমন আছে ? জানিও। আচ্ছা, যেটার জন্য তোমাকে চিঠি লেখা সেটি হলো আমাদের কলেজে কাল 'বৃক্ষরোপনের প্রয়োজনীয়তা' নিয়ে একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সেই সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন বিখ্যাত পরিবেশবিদ ডঃসুভাষ হালদার ও নির্মল কান্তি দে মহাশয়। দুজনেই পরিবেশ সমন্ধে অনেক কিছু বক্তৃতা দিলেন এবং তুমি জানলে খুঁশি হবে যে সেমিনারে শুধু আমাদের বাংলা বিভাগই না। সমস্ত বিভাগের ছাত্রীরা এসেছিল বক্তৃতা শোনার জন্য। টানা ৩ ঘন্টা ধরে হয়েছিল সেমিনার এবং আমরা সেই সেমিনার থেকে অনেক কিছু জানতে ও শিখতে পারলাম। যেমন ধরো আমাদের মূল ভূখণ্ডে কমপক্ষে ৩৫ শতাংশ গাছ থাকা দরকার। কিন্তু আমাদের দেশে তা নেই, এবং যে ২৫ শতাংশ আছে তাও নির্বিচারে বংস করা হচ্ছে, ফলে বাতাসে কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ দ্রুত বেড়েই চলেছে। এবং অক্সিজেনের পরিমাণ খুবই কমে যাচ্ছে। গাছ আমাদের ত্যাগ করা কার্বণ-ডাই-অক্সাইড গ্রহণ করে অক্সিজেন ত্যাগ করে পরিবেশের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখে। আর সেই গাছ আমরা নির্বিচারে বংস করে চলেছি অবিরত। ফলে পরিবেশে বাড়ছে দূষণের মাত্রা। নানা রোগ, ব্যাধির সৃষ্টি হচ্ছে। কলকারখানা, বাড়ি, ফ্ল্যাট, ইত্যাদি তৈরীর ফলে কাটা পড়ছে অনেক গাছ ফলে দূষণের মাত্রা বেড়েই চলেছে। গাছ থেকে আমরা কাঠ, মধু, মোম, ওষুধ, জ্বালানি, আরও নানান উপকরণ পেয়ে থাকি। তবুও যে কোনো গাছ বংস করে চলেছি তিনি আমাদের কাছে এই প্রশ্ন রেখেছিলেন।

তিনি আরও বলেন যে এইভাবে যদি আমরা নির্বিচারে গাছ কেটে চলি তাহলে ২০৩০ সাল নাগাদ পৃথিবীর ভয়াবহ খরা দেখা দেবে যা কেউ কল্পনাই করতে পারেনি এখনও। চারিদিকে ধূ ধূ প্রান্তর আর ফুটিফাটা মাটি ছাড়া আর কিছুই দেখা যাবে না। একফোঁটা জলের জন্য মানুষ হাহাকার করতে থাকবে। তাই তিনি সবাইকেই বলেছেন কেউ যদি একটি গাছ কেটে থাকে সে যেন তার বদলে দুটি গাছ লাগায়।

পরে নির্মল কান্তি দে মহাশয় বক্তৃতা রাখেন সবার সামনে। তুমি জানো কিনা জানিনা আমাদের কলেজে একটি নিয়ম আছে। প্রত্যেক ছাত্রী তার জন্মদিনে কলেজে একটি করে গাছ লাগায় ফলে আমাদের কলেজে গাছের সংখ্যা খুবই বেশি। তিনি এই নিয়ম দেখে ভারী খুশিই হয়েছিলেন, এবং আমাদের কলেজের অধ্যাপক অধ্যাপিকাদের ধন্যবাদও জানিয়েছেন। ছাত্রীদের আরও বেশি করে গাছ লাগাতে উৎসাহ দেন তিনি। তুমি শুনলে অবাক হবে যে

আমাদের কলেজের স্যার, ম্যাডামরা মাঝে মাঝে গাছতলায় বসিয়েও আমাদের ক্লাস নেন। তখন খুবই ভালো লাগে আমাদের। তখন মনে হয় সত্যি এ যেন প্রকৃতি থেকে পাওয়া আসল শিক্ষা। তিনি খুবই খুশী হন এবং তাঁর বক্তৃতা শেষ করেন যাতে এই ভাবে কলেজে পড়াশোনা চলতে থাকে। আজ এই পর্যন্তই। বাবা, মা কে আমার প্রণাম জানিও। চিঠি দিও।

ডাকটিকিট
নাম - পিঙ্কি সরকার
জায়গা- সবং, গোবিন্দনগর,
পিন- ৬০২২১০
জেলা- পূর্ব মেদিনীপুর
তারিখ- ১৩.০২.২০২০

ইতি তোমার বান্ধবী–
পাপিয়া জানা
রাজা নরেন্দ্রলাল খান মহিলা মহাবিদ্যালয়
মেদিনীপুর

পত্ররচনা

পিয়ালী পাত্র, বাংলা অনার্স, ২য় সেমিস্টার

প্রিয় বান্ধবীকে মুর্শিদাবাদ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা

নাম- পিয়ালী পাত্র
গ্রাম- সুলবাঁন্দী
পোষ্ট- জিরাপাড়া
থানা- গোয়ালতোড়
জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর
পিন- ৭২১১২১

গোপ প্যালেস,
মেদিনীপুর
১৩.০২.২০২০

প্রিয় বান্ধবী অনু,

তুই কেমন আছিস ? তোর পড়াশোনা কেমন হচ্ছে ? কাকু-কাকিমা, ভাই-বোন কেমন আছে ? কাকু কাকিমাকে আমার প্রণাম জানাস। আর ভাই-বোনেদের ভালবাসা জানাস। জানিস তো আমাদের স্কুল থেকে ১১.০১.২০২০ তে তারিখে মুর্শিদাবাদ বেড়াতে নিয়ে গিয়েছিল। তার জন্যই তোকে মুর্শিদাবাদের কথা জানাতে এই পত্র লিখছি।

১১ তারিখে আমাদের স্কুল থেকে বাসে করে মুর্শিদাবাদ নিয়ে গিয়েছিল। ওখানে গিয়ে আমার কী আনন্দ হয়েছিল তা তোকে কী বলব। তুই তো জানিস মুর্শিদাবাদ একটি ঐতিহাসিক স্থান। আমরা ইতিহাসে পড়েছিলাম না মুর্শিদকুলি খাঁ, সিরাজ-উদ-দৌল্লা ওনাদের বাড়ি মানে প্রাসাদ গিয়েছিলাম। ইতিহাস পড়তে আমাদের কত বোরিং লাগত কিন্তু জানিস ওখানে গিয়ে ইতিহাস সম্বন্ধে জানতে একটুকুও বিরক্ত বোধ হয়নি। শুধু তুই আমার সাথে ছিলিনা তাই কম আনন্দ হয়েছে, তুই থাকলে আমার আরও বেশি আনন্দ হত। আমরা ওখানে ঘোড়ার গাড়িতে করে হাজারদুয়ারী গিয়েছিলাম। জানিস তো ইতিহাসও আমাদেরকে ঠকাই। আমরা জানতাম যে মানে বই-এ লেখা থাকত ১০০০ টি আসল দরজা আর ১০০ টি নকল দরজা। আরও ওখানে দেখার প্রচুর প্রচুর জিনিসপত্র আছে। যেদিকে তাকাই যেন চোখ ধাঁধিয়ে যায়। ওখানেও প্রতিটি বস্তুই বাঁধিয়ে রাখার মত। আর একটা মজার জিনিস কী জানিস তো জন্মদিনের উপহারও যে এরকম হয় তা আমার জানা ছিল না। মহারানি ভিক্টোরিয়া দেওয়া একটি বিখ্যাত ঝাড়বাতি। যেটি প্রাসাদের ব্যালকনিতে আছে। আমরা তারপরে ভারতের সবথেকে বড় ইমামবাড়া দেখলাম। মনে হবে যে কোনো শ্বেত মহল। আর একটা মজার জিনিস যেটা বললে তুই খুব হাসবি। ওখানে একটা ঘোড়া ছিল যেটা পুরো তোর মতো দেখতে। আমি জানি তুই এখন হাসছিস না। খুব রেগে গেছিস তাই তো ? কাছে পেলে হয়তো মেরেই ফেলবি আমাকে। তোকে সব কথা না বললে আমার সারাদিন যেন মন খারাপ হয়। জানিস তারপরের দিন আমরা মতিঝিল উদ্যান, কাঠগোলাপের বাগান দেখতে গিয়েছিলাম। মতিঝিল উদ্যান আমার সবথেকে আকর্ষণীয় মনে

হয়েছিল। আমার মনে হয় তোরও মতিঝিল উদ্যানে গেলে খুব ভালো লাগবে। এই উদ্যানটি ৩০০ বিঘা জমি নিয়ে গড়ে উঠেছে। তার মধ্যে একটি অশ্বক্ষুরাকৃতি হ্রদ আছে। আর যেদিকে তাকাই শুধু গোলাপের বাগান দেখতে পায়। মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী এই স্থানটিকে নতুন করে সংস্করণ করেছেন। ওখানে আর একটি আকর্ষণীয় দৃশ্য আমার মনকে নাড়া দিয়েছিল। 'ষড়যন্ত্রের আড়ালে' নামে একটি 'লাইট অ্যান্ড সাউণ্ড শো' হয়েছিল। যা আমার ঐতিহাসিক ধারণাকে এবং কূটনৈতিক ধারণাকে স্পষ্ট করে দিয়েছিল। আর কাঠগোলাপের বাগানের কথা আর কী বলব তোকে যেদিকে তাকাই যেন মন ছুঁয়ে যায়। জানিস আমরা আজিমুন্নেসা বেগমের কবরও গিয়েছিলাম। ওখানে সিঁড়ির নীচে শায়িত আজিমুন্নেসা বেগমের দেখেছিলাম। বাড়ি আসার পথে পলাশির মনুমেন্ট দেখে এসেছি। পলাশিতে গিয়ে ভেবেছিলাম যে কোনো ধূ ধূ প্রান্তর মাঠ হবে কিন্তু জানিস ঠিক তার উল্টো। পলাশি মনুমেন্ট কে ঘিরে চারিদিকে বসতি স্থাপন হয়েছে।

তুই খুব ভালো থাকিস। আর সময় হলে মুর্শিদাবাদ ঘুরে আসিস। মন দিয়ে পড়াশোনা করিস। বাড়ি গিয়ে দুজনে খুব মজা করব। পত্রের উত্তর জানাস।

ইতি–
তোর
প্রিয় বান্ধবী
পিয়ালী

নাম– অনুশ্রী কর
গ্রাম - কুমোরপুর
পোষ্ট ও থানা- সারেঙ্গা
জেলা- বাঁকুড়া
পিন-৭২১১২৮